প্রশাসন সমীক্ষা

১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৯৪

সম্পাদনা পর্ষদ

সভাপতি ঃ এ, কে, এম, হেদায়েতুল হক
রেক্টর, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সদস্য ঃ ডঃ মহীউদ্দীন খান আলমগীর
সদস্য, পরিচালন পর্ষদ
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

ডঃ এ, টি, এম, শামসুল হুদা
সদস্য, পরিচালন পর্ষদ
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সৈয়দ তানভীর মুর্শেদ
সদস্য, পরিচালন পর্ষদ
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

হীরালাল বালা
পরিচালক
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

আব্দুস সালাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

খোরশেদ আলম
সহকারী প্রকাশনা কর্মকর্তা
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সম্পাদক ঃ মজনু-নুল-হক
পরিচালক
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সম্পাদনা পর্ষদ

সভাপতি ঃ এ, কে, এম, হেদায়েতুল হক
রেক্টর, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সদস্য ঃ ডঃ মহীউদ্দীন খান আলমগীর
সদস্য, পরিচালন পর্ষদ
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

ডঃ এ, টি, এম, শামসুল হুদা
সদস্য, পরিচালন পর্ষদ
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সৈয়দ তানভীর মুর্শেদ
সদস্য, পরিচালন পর্ষদ
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

হীরালাল বালা
পরিচালক
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

আব্দুস সালাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

খোরশেদ আলম
সহকারী প্রকাশনা কর্মকর্তা
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সম্পাদক ঃ মজনু-নুল-হক
পরিচালক
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

প্রশাসন সমীক্ষা

১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা বৈশাখ ১৩৯৪

লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার ঢাকা

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশনায় ঃ
সেখ্ সিরাজ-উদ্-দীন
উপ-পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

মুদ্রণে ঃ
মডার্ণ টাইপ ফাউণ্ডার্স, প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিঃ
২৪৪, নবাবপুর রোড, ঢাকা

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
পরেশ ভট্টাচার্য

বিনিময় ঃ
১৫·০০ টাকা

সূচীপত্র

সম্পদ ব্যবহারে স্থানীয় সংগঠন, যৌথমুখীনতা ও সম্পৃক্ত পরিকল্পনা ১
ডঃ শেখ মাকসুদ আলী

বাংলাদেশ সরকারের কার্যবিধিতে নির্বাহী দায়িত্ব বিন্যাস ১৩
মোহাম্মদ সফিউর রহমান

বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচী ঃ একটি সমীক্ষা ২৯
নাসিরউদ্দীন আহমেদ

বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নের জন্য বিকেন্দ্রীকরণ ৫৭
ডঃ আকবর আলী খান
অনুবাদ ঃ মোঃ আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া

পুস্তক সমালোচনা ১০৫

সম্পদ ব্যবহারে স্থানীয় সংগঠন, যৌথমুখীনতা ও সম্পৃক্ত পরিকল্পনা

ডঃ শেখ মাকসুদ আলী

এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় অনুন্নত দেশগুলির সম্পদ সাধারণতঃ সীমিত বলে ধরা হয় এবং বলা হয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসব সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে এসব দেশে স্থানীয় পর্যায়ে সংগঠিত প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কিভাবে স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকরী সংগঠন গড়ে তোলা যায় এবং এই সব স্থানীয় সংগঠন কিভাবে সম্পদ সৃষ্টি ও তার সুষ্ঠু ব্যবহারে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে এ বিষয়ে অবশ্য যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। এই বিতর্কের একটি দিক হলো ঃ

১। এসব স্থানীয় সংগঠন কারা সৃষ্টি করবে ? এগুলো কি কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে সৃষ্টি হবে, না স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গড়ে উঠবে। যদি এগুলো দ্বিতীয় পদ্ধতিতে গড়ে উঠে তবে এগুলো কি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে উঠবে, না অরাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সমাজ কর্মীদের মাধ্যমে গড়ে উঠবে ?

২। এসব সংগঠনের দায়িত্ব কি হবে এবং কারা তার দায়িত্ব তালিকা ঠিক করবে ? এসব দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা কোথা থেকে আসবে ? সঠিক ভাবে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে এরা কার কাছে জবাবদিহি করবে ? সঠিক ভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য এদের কারা এবং কিভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালিত করবে ?

৩। দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় 'সম্পদ' এরা কোথা থেকে পাবে ? যদি সম্পদের একটা অংশ সংগঠনের বাইরে থেকে আসে তবে সম্পদ-দাতার সঙ্গে তার ব্যবহারিক ও নিয়ন্ত্রণগত সম্পর্ক কি হবে ?

এসব প্রশ্ন জটিল। এ প্রশ্নগুলি জটিলতর হয়ে উঠে যখন 'সম্পদ' ও 'সংগঠন' বলতে আমরা যা কিছু বুঝি তাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

অনুন্নত দেশে সম্পদ সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। কারণ এসব দেশে উন্নয়ন ধ্যান-ধারণা প্রধানতঃ বিদেশ থেকে আসে।

পশ্চিমা ধনতান্ত্রিক দেশের আমদানীকৃত গতানুগতিক সংজ্ঞায় সাধারণতঃ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পুঁজি গঠনের (ক্যাপিটাল ফরমেশন) উপর জোর দেওয়া হয়। বলা হয় যে পুঁজি গঠন প্রক্রিয়ায় দুইটি দিক রয়েছে। (ক) সঞ্চয় ও (খ) তার সঠিক বিনিয়োগ। দেখানো হয় যে যেহেতু অনুন্নত দেশে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা কম সুতরাং তার আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ক্ষমতাও কম। এ অবস্থায় বিনিয়োগ বাড়াতে হলে উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে এসব দেশগুলোকে উন্নত দেশ থেকে ঋণ করে বিনিয়োগ হার বাড়াতে হবে।

এ অর্থনৈতিক থিওরী অনুযায়ী বিগত তিন দশক ধরে অনুন্নত দেশগুলোর অধিকাংশ উন্নত দেশগুলো থেকে ক্রমাগত টাকা ধার করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব বার্ষিক সঞ্চয় মোট জাতীয় আয়ের ৫% এর নীচে এবং বিনিয়োগ হার সে তুলনায় প্রায় ১৬%। স্বভাবতঃই বাকী টাকাটা বাইরে থেকে ধার করতে হয়। এই বিনিয়োগে আমাদের বাৎসরিক নীট প্রবৃদ্ধি মাত্র ১% থেকে ২% এর মত। যদি এই প্রবৃদ্ধির হার বাড়াতে হয় তবে প্রাথমিক পর্যায়ে ঋণের বোঝা আরও বাড়বে।

আমাদের আমদানীকৃত উপরোক্ত ধ্যান-ধারণাসমূহ আরও জটিল হয়ে উঠে যখন আমরা দেখি যে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানোর জন্য আমরা ক্রমাগত আমাদের ঋণের বোঝা বাড়াচ্ছি কিন্তু আমাদের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার আকাঙ্খিত-ভাবে না বেড়ে প্রতি বছরে আমাদের ঋণের বোঝাটাই অনাকাঙ্খিতভাবে বেড়ে যাচ্ছে।

কেন এমন হচ্ছে? যারা আমাদের ঋণ দিচ্ছেন তারা এ জন্য আমাদেরই দায়ী করছেন? বলছেন যে এসব ঋণের সাহায্যে যে সব প্রকল্প তারা আমাদের তৈরী করে দিচ্ছেন বা তৈরী করতে আমাদের সাহায্য করছেন সে সব প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অথবা সদিচ্ছা আমাদের নেই।

বৈদেশিক ঋণপুষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তাই অনুন্নত দেশের প্রশাসন ব্যবস্থাকে আরও সম্প্রসারিত করতে হয়। আমাদের দেশে ১৯৫০ দশকে এই সম্প্রসারণ শুরু হয়েছে। ঋণের বোঝা বৃদ্ধি ও প্রকল্পের সমস্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সম্প্রসারণ ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে প্রায় সমান ভাবেই চলতে থাকে। তদুপরি এই সম্প্রসারিত প্রশাসন কাঠামোকে দক্ষ করে তোলার জন্য প্রধানতঃ বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারী কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। এসব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে যারা প্রশিক্ষণ দেবেন তাদের উপযুক্ত করে গড়ার জন্য বিদেশে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং তাদের কাজের ভার লাঘব করার জন্য নানা আকৃতি-প্রকৃতির 'প্রশিক্ষণ মডিউল' পর্যন্ত করে দেওয়া হয়।

যে সব অর্থনীতিতে প্রগতির হার কম সেখানে সাধারণতঃ অর্থনীতিবিদদের দাপট বেশী দেখা যায়। এসব দেশে বৈদেশিক ঋণ আসলে পরিকল্পনা কমিশনের সম্প্রসারণ ও প্রবৃদ্ধি ঘটে সবচেয়ে দ্রুত গতিতে। বিশ্বব্যাংকের মত অন্যসব

আন্তর্জাতিক সংস্থা এইসব পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানকে সুদক্ষ করার জোর চেষ্টা চালিয়ে যান, ফলে আমদানীকৃত নানাবিধ উন্নয়ন মডেলে দেশ ভরে যায়। এইসব মডেলকে কার্যকরী করার জন্য পশ্চিমা ধাঁচে গবেষণা ও সেই সঙ্গে জন্ম হয় একটি নূতন শ্রেণীর, যারা গবেষণা ও মূল্যায়ন 'বিশেষজ্ঞ' বলে নিজেদের দাবী করেন।

এইসব গবেষণা ও মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞরা অন্যান্য অনুন্নত দেশের মত বাংলাদেশেও অনেক মূল্যবান অবদান রেখে চলেছেন। এক্ষেত্রেও বৈদেশিক ঋণ এইসব গবেষণা ও মূল্যায়ন সমীক্ষকদের অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে সমৃদ্ধ করেছে। ফলে আমরা অনেক নূতন কথা ও সুরের সন্ধান পেয়েছি, যেমন---দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প, অংশগ্রহণ মূলক পরিকল্পনা, মৌলিক চাহিদা ও তার সূচক ইত্যাদি।

এসব উপাদেয় কথামালার উজ্জ্বলতায় অনুন্নত-উন্নয়নশীল দেশের দরিদ্র মানুষেরা কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে। তাঁদের জন্য যেটা দরকার তা হচ্ছে আত্মনির্ভরশীল সংগঠন, পরনির্ভরশীল কথা নয়। আত্মনির্ভরশীল একটা অর্থনীতি গড়ে তুলতে হলে সাংগঠনিক আত্মবিশ্বাসেই কথা বলবে এবং কাজের মধ্যে এ আত্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যাবে। আমি প্রায় ৭ বছর আগে কিছু প্রশিক্ষণার্থী ডাক্তারদের এমন একটা গ্রামে নিয়ে গিয়েছিলাম যেখানে মানুষ কাজ করছে এবং নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধানের চেষ্টা করছে। ডাক্তার সাহেবেরা যখন জানলেন যে এ গ্রামে দরিদ্রতা দূর করার কিছু চেষ্টা হয়েছে তখন তারা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জানতে চাইলেন যে তারা 'দারিদ্র্যের' কোন 'সংজ্ঞা' ব্যবহার করছেন? প্রত্যুত্তরে গ্রামবাসীরা জানতে চাইলেন 'সংজ্ঞা' জিনিসটা আসলে কি? গ্রামবাসীদের যখন বোঝানো হলো 'সংজ্ঞা' কি তখন তারা বললেন ঐ জিনিসটা তাদের খুব বেশী দরকার নেই, কারণ তাদের গ্রামে কাদের সত্যিকার অর্থে কি ধরণের সাহায্য দরকার সে সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ভাবেই তাদের জ্ঞান রয়েছে। এরপর আলোচনা যে ভাবে চল্লো তার সংক্ষিপ্ত বিবরণী নীচে দিচ্ছি:

প্রঃ আপনারা আপনাদের গ্রামের দরিদ্রদের জন্য কি করেছেন?

উঃ আমরা এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে একখণ্ড জমি নিয়ে তা চাষের জন্য বিতরণ করেছি।

প্রঃ কিন্তু যে ভাল চাষ জানে না তাকে জমি দিয়ে কি হবে?

উঃ ভাল চাষী নয় এমন কাউকে তো আমরা জমি চাষ করতে দেই নাই।

প্রঃ যারা ভাল চাষী নয় তাদের জন্য কি করেছেন?

উঃ তাঁদের আমরা মাছ চাষের একটা খাস পুকুর বন্দোবস্ত করে দিয়েছি।

প্রঃ কিন্তু মাছ চাষ থেকে আয় করতে হলে বছর দুই সময় দরকার। এই সময় তারা কি খাবে?

উঃ মাছ চাষের সময় খাওয়া-দাওয়ার সামর্থ একেবারেই যাদের নেই তাদের তো আমরা পুকুর দেই নাই।

প্রঃ যাদের এখনই খাওয়া-দাওয়ার সামর্থ নেই, তাদের জন্য আপনারা কি দিয়েছেন?

উঃ তাঁদের আমরা রিক্সা ভাড়া করে দিয়েছি।

প্রঃ কিন্তু যাদের শারীরিক সামর্থ নেই তারা রিক্সা কি করে টানবে?

উঃ এরূপ লোকদের তো আমরা রিক্সা দেই নাই। এদের আমরা ঢাকা থেকে পুরানো কাপড় কিনে দিয়েছি। তারা এগুলি ধুয়ে পরিষ্কার ও ইস্ত্রী করে বিক্রি করছে।

আমাদের বুদ্ধিজীবিদের তাত্বিক ধ্যান-ধারণায় সমৃদ্ধিশালী না হয়েও যে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ তাদের নিজেদের সমস্যা সঠিক ভাবে চিহ্নিত করতে পারে এবং সেসব সমস্যার বাস্তবানুরূপ সমাধান দিতে পারে উপরোক্ত কথাবার্তায় তার ইংগিত রয়েছে। আমরা ইচ্ছে করলে এ ধরনের বহু ইংগিত যে কোন গ্রামের আনাচে কানাচে পেতে পারি। কিন্তু পশ্চিমা জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে রংগীন চশমা আমরা শক্ত করে আমাদের চোখে পড়ে ফেলেছি তার কাঁচ ভেদ করে আমাদের নিজেদের গতিশীলতার সংবাদ পাওয়া খুব একটা সম্ভব নয়।

আমাদের দেশের সমস্যা যদি আমাদের সঠিক ভাবে বুঝতে হয় তবে এ চশমা অবশ্যই খুলতে হবে। তখন আমরা দেখবো যে আমাদের সমস্যা প্রধানতঃ পুঁজি গঠন নয় এবং সেইজন্য আমাদের ঋণের বোঝার ক্রমবৃদ্ধির কোন যৌক্তিকতা নেই। আমাদের প্রধান সমস্যা আমাদের অগণিত মানুষের বিধিদত্ত বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও কর্মক্ষমতাকে সংগঠনের মাধ্যমে কাজে লাগানো ও কাজের মাধ্যমে তাকে বাড়িয়ে তোলা। অবশ্যই এ ধরণের কার্যক্রম আমাদের ঋণদাতাদের নিকট গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা কম কারণ তাতে তাদের উপর আমাদের নির্ভরশীলতা কমে যাবে।

সুতরাং স্থানীয় পর্যায়ে যে সব সংগঠন আমরা গড়ে তুলতে যাচ্ছি তাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত আমাদের মানব সম্পদের উন্নয়ন, পশ্চিমা অর্থে বৈদেশিক ঋণের বোঝা ভারী করে পুঁজিগঠন নয়। বৈদেশিক পুঁজি সংগ্রহ না হলে আমাদের মানব সম্পদ উন্নত হবে না বা তার সুষ্ঠু ব্যবহার হবে না, একথা ঠিক নয়। বরং আমাদের মানব সম্পদ উন্নয়নের মধ্যেই আমাদের পুঁজি গঠনের সৃজনশীলতা রয়েছে। আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

পশ্চিমা অর্থনীতিবিদরা আমাদের মৌলিক চাহিদা মডেলের কথা বলছেন। আমাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিল্প, স্বাস্থ্য সব কিছু দরকার কিন্তু পশ্চিমা বিশ্লেষণে যেহেতু আমাদের সম্পদ সীমিত সেহেতু এই সবগুলি আমাদের একত্রে পাওয়া সম্ভব নয়।

আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রশ্ন উঠে। অথচ আমরা এ পর্যন্ত যে তিনটি পরিকল্পনা করেছি তাদের কোনটাতেই আমরা সত্যিকার অর্থে আমাদের মৌলিক চাহিদার অগ্রাধিকার ঠিক করতে পারি না। কখনও আমরা কৃষি, কখনও কর্মসংস্থান, কখনো অবকাঠামো, কখনো সবগুলোতে একই ঝুঁড়িতে রেখে অগ্রাধিকার দিয়েছি। ফলে, কোন ক্ষেত্রেই আমরা বড় রকমের সাফল্য আনতে পারি না। আমাদের এই বিফলতাকে সামনে রেখে

আমরা এমন একটি গ্রামের গ্রামকর্মীদের কাছে গেলাম যারা গ্রাম পর্যায়ে বেশ কিছুটা সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছে। আমরা তাদের বল্লাম যে, আপনারা কি ভাবে আপনাদের সমস্যা চিহ্নিত করছেন ও তাদের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করছেন? তাদের উত্তর ছিলো ঃ

"আমাদের দ্বিতীয় অগ্রাধিকার হচ্ছে খাদ্য সমস্যা। প্রথম সমস্যাটি জটিল তাই আমরা পরে বলবো।"

আমাদের খাদ্য ঘাটতি আমরা জরীপের মাধ্যমে বের করেছি। গ্রাম পর্যায়ে জরীপ সঠিক হতে হবে।

আমাদের তৃতীয় সমস্যা জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি। এর ফলে আমাদের খাদ্য ঘাটতি এক বছর কমালেও পরের বছর বেড়ে যায়। সুতরাং উন্নয়ন কার্যক্রমে আমাদের তৃতীয় অগ্রাধিকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। তবে আমরা জানি যে আমাদের দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অবিলম্বে আশানুযায়ী সফল হবেনা। তাই খাদ্যের উৎপাদন আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির আরও উপরে বাড়াতে হবে। কৃষি উৎপাদনে আমাদের যে গতানুগতিক জ্ঞান রয়েছে তা নিয়ে কৃষির এই ধরণের প্রবৃদ্ধি সম্ভব হবে না। এজন্য দরকার কৃষি সম্পর্কে উচ্চতর জ্ঞান। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এ ধরণের জ্ঞান লাভ চাষীদের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং আমাদের চতুর্থ অগ্রাধিকার হবে 'ব্যবহারিক শিক্ষা', পুঁথিগত শিক্ষা নয়। আমাদের পঞ্চম অগ্রাধিকার বেকার মানুষের কর্মসংস্থান। এজন্য অকৃষি খাতে কর্ম সংস্থানের সুযোগ বাড়াতে হবে। সেজন্য রিলিফ নয়, উৎপাদনমুখী ঋণ সহজ শর্তে সময়মত, যথেষ্ট পরিমাণ পাওয়া প্রয়োজন, তবে তা আসবে গ্রাম থেকে। এখন গ্রামের সঞ্চিত টাকা শহরে চলে যাচ্ছে।

আমাদের ষষ্ঠ অগ্রাধিকার সামাজিক ও যৌথ মূল্যবোধ। আমরা বর্তমানে নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। এটা ঠিক নয়। গ্রামকে আত্মনির্ভরশীল করতে হলে আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করে যৌথমুখী হতে হবে। আমাদের শ্লোগান হবে আমাদের গ্রামে কেউ অভুক্ত থাকবে না। আমাদের সপ্তম অগ্রাধিকার গ্রামীণ কোন্দল ও দ্বন্দ্বের মীমাংসা। গ্রাম পর্যায়ে নিজেদের মধ্যে কিছুটা বিরোধ থাকা স্বাভাবিক তবে তা গ্রামীণ পর্যায়েই মীমাংসা হওয়া দরকার। সংগঠনের মাধ্যমে এই মীমাংসা সম্ভব। বস্তুতঃ গ্রামীণ কোন্দলের মীমাংসা ছাড়া কোন উন্নয়ন কার্যক্রম সম্ভব নয়। তাই এই সপ্তম অগ্রাধিকার আসলে আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার।

গ্রামবাসীদের কাছ থেকে পাওয়া এ ধরনের বিশ্লেষণ আমাদের বুদ্ধি সম্পর্কে আমাদের সন্দিহান করে দেয়। আমরা সারা বাংলাদেশের সার্বিক খাদ্য ঘাটতির নিভু্ল হিসাব দিতে পারি কিন্তু বাংলাদেশের কোন গ্রামে খাদ্য ঘাটতি ঠিক কতটুকু তা বলতে পারিনা। তবে আমরা খাদ্য ঘাটতির সার্বিক পরিসংখ্যান কিভাবে পেলাম? আমরা কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের কথা বলছি কিন্তু আমাদের

উন্নয়ন কার্যক্রমে আমরা গ্রামকে দরিদ্রতর করে গড়ে তুলছি এবং ক্রমাগত ভাবে ব্যক্তিস্বার্থ ভিত্তিক ব্যক্তি উদ্যোগকে প্রতিপালন করেছি। ফলে আমাদের শিল্প-পতিরা ও ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফা লাভে ব্যস্ত। দরিদ্র জনসাধারণের খাওয়া-পরার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেওয়ার সময় তাদের কোথায়? তাছাড়া ব্যক্তিস্বার্থ ভিত্তিক উন্নয়ন পরস্পরের সঙ্গে ও সমাজের সঙ্গে তাদের বৈপরীত্য বাড়িয়ে দিচ্ছে। নিজেদের কল্যাণ কামনায় তাই তাদের অনেকেই নিজেদের সন্তান সন্ততিদের দেশে নয়, বিদেশে মানুষ করছেন। এইসব বিদেশী বাংগালীরা কি বাংলাদেশের উপবাসী জনগণকে চিনতে পারবেন? তাদের ক্যালকুলেটারে আমাদের এসব সামাজিক বৈপরীত্য কি ধরা পড়ছে? বলা যেতে পারে যে আমাদের এই সামাজিক বিভ্রান্তি আসলে আমাদের রোগ নয়? রোগের লক্ষণ। আসল রোগ 'কাঠামোগত'। আমাদের সমাজের উৎপাদনের উপকরণ গুটি কতক লোকের হাতে সীমাবদ্ধ। এ কাঠামোগত ব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে শুধু 'লক্ষণ' দেখে 'চিকিৎসা' চলবে না।

কথাটা অস্বীকার করছি না তবে কাঠামোগত পরিবর্তনের কথা আমরা অৰ্দ্ধ শতাব্দী ধরে বলে আসছি। কিন্তু ব্যাপক পরিবর্তন আসছে কই, প্রান্তিক পরিবর্তন ছাড়া? সেই জন্যেই কিছু কিছু গ্রাম রোগ নয়, 'লক্ষণের' উপর ভিত্তি করেই সংগঠনের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়াস পাচ্ছে। কোন সময়ে তারা আংশিক ভাবে পারছেন কোন সময়ে হারিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু গতিশীল প্রক্রিয়া চলছে। আমরা যদি কাঠামোগত পরিবর্তন না আনতে পারি তবে সেই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও আমরা কি এই গতিশীল প্রক্রিয়াকে অন্ততঃ আর একটু প্রাণবন্ত করতে পারবো?

বর্তমান কাঠামোগত সীমাবদ্ধতার মধ্যেও জনসাধারণ কিভাবে কিছু কিছু গ্রামে নিজেদের কিছুটা সংগঠিত করে গ্রাম উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছেন, সেই গতিশীল প্রক্রিয়া বোঝার জন্য ১৯৮০ সালে আমরা ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান চালিয়েছিলাম। আমাদের অনুসন্ধানে আমরা দেখতে পাই যে অনুন্নয়নের সমুদ্রে যদি কোন গ্রাম আপন মহিমায় কিছুটা প্রদীপ্ত হয়ে উঠে তবে তার প্রধানতঃ তিনটি কারণ থাকে, প্রথমতঃ প্রায় স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেওয়া যায় যে সে গ্রামে কিছু নিঃস্বার্থ সমাজ-কর্মী রয়েছে যারা এই উন্নয়ন কার্যক্রমে সবচেয়ে বেশী উদ্যোগী ভূমিকা রেখেছেন তবে বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামেই সাধারণতঃ নিঃস্বার্থ সমাজ কর্মীদের কাজ করার সুযোগ কম কারণ উন্নয়ন কার্যক্রম যদি গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণকে সংগঠিত ও উন্নত করে তবে তা গতানুগতিক নেতৃত্বের কাছে সাধারণতঃ গ্রহণীয় হয় না। কারণ সংগঠিত জনগণ গতানুগতিক নেতাদের নেতৃত্ব বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে চাইবেনা। সেই জন্য গ্রামের গতানুগতিক নেতৃত্ব দরিদ্র শ্রেণীকে সংগঠিত হতে দিতে চায় না। কাজেই সমাজ কর্মীদেরকে উন্নয়ন কার্যক্রম গতানুগতিক নেতৃত্বের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। এ সত্ত্বেও যদি দেখা যায় যে কোন গ্রাম উন্নয়ন কার্যক্রমে এগিয়ে যাচ্ছে তবে বলতে হয় যে সেই গ্রামে এমন কিছু

সমাজকর্মী রয়েছেন যারা উন্নয়ন কার্যক্রমে গতানুগতিক নেতৃত্বের সমাজ বিরোধিতা কি করে কাটিয়ে উঠতে হয় তার কলা-কৌশল রপ্ত করেছেন। এই কলা-কৌশল রপ্ত করাই গ্রাম উন্নয়নের দ্বিতীয় কারণ। গ্রাম উন্নয়নের তৃতীয় কারণ হচ্ছে নিঃস্বার্থ সমাজ কর্মীদের সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসনের সংযোগ। আমরা আমাদের অনুসন্ধানে দেখেছি যে সমাজ কর্মীরা গ্রামের গতানুগতিক নেতৃত্বের বাধা নিষেধ অতিক্রম করে গ্রাম উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নিলেও স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা ছাড়া বেশীদূর এগিয়ে যেতে পারে না। কারণ উন্নয়ন কার্যক্রমে উপকরণ, উন্নত প্রযুক্তি এবং সহায়ক বুদ্ধি পরামর্শের দরকার। এসব জিনিস স্থানীয় প্রশাসনের সাহায্য ছাড়া সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের গ্রামগুলোর উন্নতি করতে হলে আমাদেরকে (১) ঐ সব গ্রামে নিঃস্বার্থ সমাজকর্মীদের খুঁজে পেতে হবে এবং তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে (২) সমাজ কর্মীদের শুধু উন্নয়ন কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করলেই চলবেনা তাদেরকে গতানুগতিক নেতৃত্বের বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে উন্নয়ন কার্যক্রমে এগিয়ে যাবার কলাকৌশল শিক্ষা দিতে হবে, এবং (৩) স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমাজকর্মীদের সংযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে যাতে উন্নয়ন কার্যক্রমে যে সব উপকরণ, প্রযুক্তি ও বুদ্ধি পরামর্শ প্রয়োজন সে সব যথাযথভাবে সমাজকর্মীরা পেতে পারে। এই শেষের কাজটি হচ্ছে সব চেয়ে কঠিন কারণ স্থানীয় প্রশাসনে যে সব সরকারী কর্মচারীরা রয়েছে তাদের অধিকাংশের সংযোগ গ্রামের নিঃস্বার্থ সমাজকর্মীদের সাথে নেই বরং রয়েছে স্বার্থপর গতানুগতিক নেতৃত্বের সঙ্গে। এই সংযোগ অনেক সময় পরস্পরের স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ এরূপ সংযোগে সরকারের কাছে থেকে পাওয়া অনুদানের একটি অংশ ভাগাভাগি করে নেবার সুযোগ থাকে। অনেক সময় আবার পরিবেশের চাপে এ ধরণের সংযোগ বজায় রাখা প্রয়োজন হয়, না হলে স্থানীয় কর্মচারীরা গ্রাম অঞ্চলে টিকে থাকতে পারে না।

১৯৭৭ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত বেশ কিছু সংখ্যক সরকারী কর্মচারীদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে তাদের নিজ গ্রামে পাঠানো হয়, নিজেদের গ্রামগুলোকে উন্নত করার জন্য। প্রশিক্ষণের সময় তাদেরকে আমরা বলি যে তারা যেন তাদের গ্রামের নিঃস্বার্থ সমাজকর্মীদের খুঁজে বের করে এবং এইসব নিঃস্বার্থ সমাজকর্মীদের উন্নয়ন কার্যক্রমে বাধা বিপত্তি উত্তরণের কলা-কৌশল শিখিয়ে দেয় এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারীদেরকে এইসব নিঃস্বার্থ সমাজকর্মীদের সঙ্গে সংযোগ করে দেয়, কিন্তু আমাদের এ প্রচেষ্টা খুব একটা সফল হয়নি। কারণ (১) সরকারী কর্মচারীরা উন্নয়ন কার্যক্রমে সাধারণতঃ গতানুগতিক নেতৃত্বের উপরই নির্ভর করে এসেছে, নিঃস্বার্থ সমাজ কর্মীদের উপরে নয়; (২) নিঃস্বার্থ সমাজকর্মীরা সাধারণতঃ উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে অনেক সময় বিপদগ্রস্ত হয় এবং এই কারণে পুনরায় উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণে তাদের একটা স্বাভাবিক অনীহা রয়েছে; (৩) থানা পর্যায়ের অফিসাররা উন্নয়ন কার্যক্রমে গ্রামে আসতে সাধারণতঃ নারাজ, তারা চায় জনসাধারণ তাদের কাছে

আসুক। তাছাড়া থানা পর্যায়ে এইসব অফিসারদের সংযোগ গতানুগতিক নেতৃত্বের সঙ্গেই বেশী, নিঃস্বার্থ সমাজকর্মীদের সাথে নয়।

নিঃস্বার্থ সমাজকর্মী কারা? নিঃস্বার্থ সমাজকর্মী হিসাবে আমরা যাদের পরিচয় পেয়েছি তারা সাধারণতঃ সেই সব পরিবার থেকে আসে যে সব পরিবারের সমাজ উন্নয়নমূলক কাজকর্মের কিছুটা অতীত ট্রাডিসন ও অভিজ্ঞতা রয়েছে। তা ছাড়াও তারা নিজে থেকেই সমাজকল্যাণে বেশ কিছুটা উদ্বুদ্ধ। তারা কেন সমাজের জন্য চিন্তা করে এ প্রশ্নের উত্তরে তারা বলে যে তারা শুধু 'ব্যক্তিই নয় সামাজিক জীবও বটে'। ব্যক্তি হিসাবে ব্যক্তিগত স্বার্থ অবশ্যই তাদের কাজকর্ম প্রভাবান্বিত ও নিয়ন্ত্রিত করে তবে সামাজিক জীব হিসেবে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কেও তারা বেশ কিছুটা সচেতন

ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে প্রশিক্ষণ বড় ধরণের দায়িত্ব পালন করতে পারে, তবে সে প্রশিক্ষণ গতানুগতিক ধরণের নয়। গতানুগতিক প্রশিক্ষণ পশ্চিমা চিন্তাবিদরা তাদের থলিতে করে অনুন্নত দেশের জন্য নিয়ে আসেন। তাদের চিন্তা ব্যক্তি স্বার্থের 'গতিশীলতায়' আচ্ছন্ন। এই গতিশীলতার ভিত্তি হচ্ছে ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ জে,এস, মিলের "ইউটিলিটারিয়ান দর্শন"। এর মূল কথা হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন আনতে হলে ব্যক্তিকে ভয়ংকর স্বার্থপর হতে হবে। তবে যদি বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতা অক্ষুণ্ণ থাকে তবে এতে ভয় করার কিছুই নেই। বিভিন্ন ব্যক্তির পারস্পরিক সংঘাত বাজারের অদৃশ্য হাতের কলকাঠিতে সমাজে ভারসাম্য ও কল্যাণ নিয়ে আসবে।

পশ্চিমা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি এভাবে সামাজিক কল্যাণ আনতে পারবে, এ দাবী সমাজতন্ত্রীরা স্বীকার করে না বরং তারা বলে যে এ সমাজে সম্পদের মালিকানা যাদের হাতে তারা নিঃসহায়দের শোষণ করবে এবং সমাজে বৈপরীত্য বাড়বে। পশ্চিমের ধনতন্ত্রবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রীদের মতপার্থক্য এতই বেশী যে সারা পৃথিবী এখন দুটো বড় ব্লককে ভাগ হয়ে মারনাস্ত্রের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। মারনাস্ত্র তৈরীতে এদের সম্মিলিত ব্যয় বর্তমানে ১০,০০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এই ব্যয়ের যদি কিছুটাও পৃথিবীর দরিদ্র মানুষের জন্য ব্যয় হতো তবে পৃথিবীর ইতিহাস অন্যভাবে লেখা যেতো। কিন্তু তাদের জীবন দর্শনের রঙীন চশমা ছাড়া তারা পৃথিবীকে দেখবেনা, ফলে সারা পৃথিবী এখন ভীত, কোন মুহূর্তে তৃতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, যখন মানুষও থাকবেনা সমাজে শক্তিরও প্রয়োজন হবে না।

মানুষকে পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রাখতে হলে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে সমাজ সচেতনতা থাকা দরকার। সেই জন্যই নিঃস্বার্থ সমাজ কর্মীরা ব্যক্তি স্বার্থের চেয়ে 'যৌথ মূলবোধে' বেশী বিশ্বাসী। তারা মনে করে সামাজিক জীব হিসাবে সমাজের প্রতি তাদের একটা কর্তব্য রয়েছে। যে সব গ্রামে সমাজকর্মীদের উদ্যোগে কিছুটা উন্নয়ন আসছে সেখানে আমরা এই যৌথমুখীনতার বহিঃপ্রকাশ দেখছি, যেমন বলা হচ্ছে

"আমাদের গ্রামে আমরা কাউকে অভুক্ত থাকতে দেবো না, কিন্তু কেউ বেকারও থাকতে পারবে না।"

এ ধরনের যৌথমুখী দর্শন ও কার্যক্রমে সমাজকর্মীরা যখন কাজে নেমে পড়ে তখন তারা 'সমমনা' লোকদের খোঁজ করে। যেসব সংগঠনে এ ধরনের সমমনা লোকের সমাবেশ থাকে সেখানে স্বাভাবিকভাবেই সমাজকর্মীরা আকর্ষিত হয়। আবার এই ধরনের যৌথমুখী সংগঠন সমাজকর্মীদের সমাজ সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করে। সুতরাং এ কার্যক্রম একটা বৃত্তকার চক্রে পরিবর্দ্ধিত হয়।

গতানুগতিক নেতৃত্বের মধ্যে ব্যক্তি স্বার্থের পরিমাণ যৌথমুখীনতার তুলনায় বেশী। কাজেই তাদের পক্ষে নিঃস্বার্থ সমাজকর্মীর ভূমিকা পালন সাধারণতঃ সম্ভব নয়। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও সমাজ সচেতনতা ও যৌথমুখীনতা কম। তাছাড়া তারা নিজস্ব ডিপার্টমেন্ট কেন্দ্রিক। তারা তাদের মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও পরিদপ্তরের বাইরে বেশী কিছু ভাবতে পারে না এবং সে জন্য অন্যান্য মন্ত্রণালয় বিভাগ, দপ্তর ও পরিদপ্তরের সাথেও তারা সাধারণতঃ ততটা সহযোগিতা করতে পারে না। এ জন্যই আমাদের প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রশাসনিক ও উন্নয়ন সমন্বয়ের এত অভাব। তাছাড়া রয়েছে সরকারী কর্মচারীদের আত্ম-অহংকার। দরিদ্র জনগণের কাছে থেকে তারা বুদ্ধি নিতে সাধারণতঃ অনিচ্ছুক। বুদ্ধি ধার করতে তাদের অনেকের অবশ্য লজ্জা নেই, তবে সেটা বিদেশ থেকে। অন্যদিকে আমরা দেখছি যে পশ্চিমা ধ্যানধারনা সমাজতান্ত্রিক ও ধনবাদী দেশ সমূহের মধ্যেও সহযোগিতা ও সমন্বয় সৃষ্টি করতে পারছে না। কাজেই প্রশ্ন উঠে তারা তাদের স্বার্থ কেন্দ্রিক দর্শন দিয়ে আমাদের গ্রামাঞ্চলে কি করে সমাজ সচেতনতা ও যৌথমুখীনতা সৃষ্টি করবে?

আমরা কি আমাদের আত্মকেন্দ্রিক গতানুগতিক নেতৃত্বকে এবং আত্মগরিমায় অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রশাসনকে যৌথমুখী করতে পারবো? আমরা আগেই বলেছি সঠিক প্রশিক্ষণ এক্ষেত্রে একটি গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে পারে, তবে এ প্রশিক্ষণ সুবিক্ষণে অট্টালিকার প্রশিক্ষণ কক্ষে হবেনা এবং পশ্চিমা ব্যবস্থাপনায় পারদর্শী প্রশিক্ষকদের দ্বারাও হবে না। এ প্রশিক্ষণ দেবে সেই সব সমাজকর্মীরা যারা 'সামাজিক জীব' হিসাবে উদ্বুদ্ধ এবং উন্নয়ন কার্যক্রমে গতানুগতিক নেতৃত্বের বিরোধিতা ও প্রশাসনিক অনীহাকে উত্তরণের কলা-কৌশল জানে এবং সে প্রশিক্ষণ হবে মাঠ পর্যায়ে, যৌথমুখী কার্যক্রমের কঠিন বাস্তবতায়।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে আমরা কি তাহলে আমাদের কার্যক্রমকে শুধু গ্রাম পর্যায়েই সীমিত রাখবো? আমরা কি সমগ্র দেশের জন্য সংযুক্ত একটা উন্নয়ন মডেলের চিন্তা করবো না, যেখানে কৃষি ও শিল্প, গ্রাম ও শহর সমন্বিত ভাবে উন্নত হবে এবং একটা পরিবর্দ্ধিত অবকাঠামো এই উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে ক্রমাগত সমৃদ্ধ করবে? অবশ্যই এ ধরনের সমন্বয় প্রয়োজন তবে আমরা মনে করি সামগ্রিক ভাবে একটা যৌথমুখী দর্শন যদি জাতীয় জীবনের মুলভিত্তি না হয় তবে আমাদের ঈপ্সিত সমন্বয় পরিকল্পনা প্রশিক্ষণের পঞ্চম-বার্ষিকী পরিকল্পনার

পৃষ্ঠাগুলিতে এবং আন্তঃ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সমন্বয় কমিটির প্রতিবেদনের মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ থাকবে। কার্যকরী সমন্বয়ের জন্য আমাদের যৌথমুখীনতার মূল-মন্ত্র, আমাদের শহর ভিত্তিক সভ্যতাকে আমাদের গ্রামাঞ্চল থেকে শিখতে হবে। আগেই বলেছি আমরা যে গুটি কতক গ্রামে সফল উন্নয়ন কার্যক্রমের বিকাশ দেখেছি সেখানে উন্নয়নের দর্শনই হচ্ছে "আমরা আমাদের গ্রামের কাউকে অভুক্ত থাকতে দিবো না কিন্তু তাদের কেউ অলসও থাকতে পারবেনা।" এ জীবন দর্শন আমাদের জন্য অপরিচিত কিছু নয়, এ জীবন দর্শন এখনও আমাদের সমাজেই রয়েছে তবে তার খোঁজ করতে হলে সমাজের নীচুস্তরে নেমে যেতে হয়। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা যদি আমরা চিন্তা করি তবে এ যুক্তির সমর্থন পাওয়া যাবে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় সমাজের উচ্চতর অংশের অনেকেই নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে গ্রামে ঢুকে পড়েছিলেন। সেদিন যদি গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণ তাদের নিজেদের খাদ্য ও শয্যা দিয়ে এইসব 'মুসাফিরদের' সাহায্য না করতো তবে স্বাধীনতার পরে তারা বীরদর্পে শহরে প্রত্যাবর্তন করতে পারতো কিনা সন্দেহ। কিন্তু ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষের সময় যখন ক্ষুধার্ত গ্রাম-বাসী দলে দলে শহরে ছুটে এসেছিলো তখন আমাদের আত্মকেন্দ্রিক উচ্চ ও মধ্যবিত্তরা কি তাদের চোখে দেখতে পেয়েছিলো?

আমাদের গ্রামাঞ্চলে যদি এখনও কিছুটা যৌথমুখীনতা থেকে থাকে তবে আমরা কেন তাকে ব্যবহার করবো না? যদি তা করতে হয় তবে গ্রামা-ঞ্চলে আমাদের সমাজকর্মীদের খুঁজে বের করতে হবে। এটাই হবে আমাদের পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রথম অধ্যায়। আমাদের মনোক্রী পরিকল্পনার দ্বিতীয় অধ্যায় হবে এদের মাধ্যমে আমাদের উন্নয়ন কার্যক্রমকে গ্রাম থেকে ইউনিয়নে এবং ইউনিয়ন থেকে উপজেলায় সমন্বিত করা এবং কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত অনুদান ও স্থানীয় পর্যায়ে সংগৃহীত সম্পদকে এই কার্যক্রমের জন্য ব্যয় করা। আমাদের পরিকল্পনার তৃতীয় অধ্যায় হচ্ছে আমাদের বর্তমান পরিকল্পনার ম্যাক্রো কাঠামোকে এই উদ্যোগের সাথে সমন্বয় করা।

আমাদের গতানুগতিক পরিকল্পনা "ইনপুট আউটপুটের" একটি অত্যন্ত দুর্বল ও ছেলেমানুষী কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই বাঁশের কেল্লা তৈরী করার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, অজস্র দেশী বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সমৃদ্ধ করা হয়েছে কিন্তু লাভ কি হয়েছে? আগেই বলেছি আমাদের গতানুগতিক পরিকল্পনায় আমরা সারা দেশের ক্ষেত্রে কত খাদ্য, কত মৎস, কত হাঁস মুরগী, কত গরু ছাগল প্রয়োজন ও কত ঘাটতি সব নিঃখুত ভাবে বলে দিতে পারি, পারিনা শুধু কোন গ্রামে এসব জিনিসের কত ঘাটতি এবং কি করে এইসব ঘাটতি পূরণ করতে হবে তা বলে দিতে। ফলে আমাদের পরিসংখ্যান প্রতিবেদন ও দেশে খাদ্য দ্রব্যের ঘাটতি দুটিই স্ফীত হচ্ছে। আমরা যদি আমাদের গ্রাম পর্যায়ে সঠিক পরিসংখ্যান না জানি, তবে জাতীয় পর্যায়ে আমাদের পরিসংখ্যান কিভাবে নিখুঁত হচ্ছে এটা জিজ্ঞেস করা কি অন্যায়? আর জাতীয় পর্যায়ে পরিসংখ্যানে

যদি ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে তবে আমাদের পরিকল্পনার ম্যাক্রো কাঠামোর ইনপুট আউটপুট কো-ইফিসিয়েন্টগুলি কি দুর্বল হবে না ? এমন একটা অবকাঠামোকে কি আমরা বাঁশের কেল্লা বলবোনা ?

গতানুগতিক পরিকল্পনা কাঠামোয় আমরা বাঁশের কেল্লাটিকেই দেখি, মানুষকে দেখিনা। মানুষ দেখিনা বলে মানুষকে কি করে যৌথমুখীনতায় সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে হয় তাও জানিনা। আবার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারিনা বলে মানুষকে ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির ধাঁচে শুধু উৎপাদনের শ্রমিক ছাড়া উৎপাদনের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ হিসেবে ভাবতে পারি না। এর ফলেই আমাদের বর্ধিত হারে বৈদেশিক ঋণের কথা ভাবতে হয় এবং অসহায়ভাবে বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। এ সুযোগে বৈদেশিক বিশেষজ্ঞরা অনুন্নত দেশের বুদ্ধিজীবিদের নানা ভাবে কিনে ফেলতে চেষ্টা করেন এবং তাদের চোখে রংগীন চশমা পরিয়ে দেন।

অনুন্নত দেশের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবিরা কিছুটা নিজেদের স্বার্থের জন্য ও কিছুটা তাদের অসহায়তার জন্য এ অবস্থার পরিবর্তন সহজে করতে পারবে না। তবে যদি তারা গ্রামীণ পর্যায়ে সচেতনতা ও সংগঠন সৃষ্টির কাজে সাহায্য করতে পারে তবে গ্রামে নূতনতর মানব সম্পদের সৃষ্টি হবে এবং তখন তারা দেখতে পাবে যে গ্রামে অজস্র সম্পদ রয়েছে যা নিয়ে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব। সুতরাং আমাদের নূতন পরিকল্পনার চতুর্থ অধ্যায় হবে সেই সব বুদ্ধিজীবিদের চোখ থেকে রংগীন চশমা খুলে নেওয়া, যাতে তারা ইনপুট আউটপুট কো-ইফিসিয়েন্টের দুর্বল বেড়া ডিংগীয়ে গ্রামের মানুষগুলোকে দেখতে পায় ও তাদের যৌথমুখীনতাকে আরও বেশী সচেতন ও সংগঠিত করার প্রয়াস পায়।

গ্রামের মানুষকে সংগঠিত করা ছাড়া অনুন্নত দেশে উন্নয়ন সম্ভব নয়। যে সব অনুন্নত দেশ প্রধানতঃ গ্রামীণ সেখানে গ্রামের মানুষকে প্রথমে সংগঠিত করা দরকার। এ কাজটি করার জন্য এখনও আমাদের গ্রামাঞ্চলে বেশ কিছু নিঃস্বার্থ সমাজকর্মী রয়েছে। তারা যৌথমুখীনতায় উদ্বুদ্ধ। তারা গতানুগতিক নেতৃত্বের বিরোধিতাকে এবং গতানুগতিক প্রশাসনের অনীহাকে অতিক্রম করে উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তারা গতানুগতিক প্রশাসক ও নেতাদের যৌথমুখী কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ব্যবহারিক ও বাস্তব প্রশিক্ষণ দিবারও ক্ষমতা রাখে। আমরা কি আমাদের এই আত্ম-শক্তির বিকাশের চেষ্টা করবো না আমাদের আত্ম-শক্তির ক্রমাগত অবক্ষয়ের মাধ্যমে আমাদের উন্নয়নে আমাদের মনমানসিকতাকে বিদেশী ধ্যানধারণা গ্রহণে আরও উন্মুক্ত করবো ? কাঠামোগত পরিবর্তন না আনতে পারলেও কি করে সেই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও আত্মনির্ভর উন্নয়নে কিছুটা এগিয়ে যাওয়া যায় এ প্রবন্ধে আমরা আমাদের মাঠ পর্যায়ে লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে কিছুটা ইংগিত দিলাম। তবে বলা বাহুল্য যে এ কার্যক্রম কাঠামোগত পরিবর্তনের কোন বিকল্প হতে পারে না।

টীকা

১। দেখুন : Shaikh Maqsood Ali, "The Shanirvar (Self-Reliance) Movement in the 1980s-the Social worker as Change Agents," *Administrative Science Review*, (June 1979).

২। এ ধরনের বিশ্লেষণের জন্য দেখুন : Shaikh Maqsood Ali, 'Social Development in the Third World Countries : Lessons from Experience, *Administrative Science Review*, (1982).

৩। বিভাগীয় পর্যায়ে সরকারী কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।

৪। দেখুন : Shaikh Maqsood Ali, "The Own Village Development Programme in Bangladesh ; An Experiment in Bottom-up-Planning.", *Administrative Science Review*, (March-June 1981).

৫। দেখুন : Shaikh Maqseod Ali. "The Batasan-Durgapur Format for Rural Development in Bangladesh" *Rural Development Participation Review* (Spring 1981), Coruece University, New York. Reprinted in Voluntary Action, Association of Voluntary Agencies for Rural Development (AVDRD), Feb 1982.

বাংলাদেশ সরকারের কার্যবিধিতে নির্বাহী দায়িত্ব বিন্যাস

মোহাম্মদ সফিউর রহমান

যে কোন রাষ্ট্রেই সরকারী কার্যবিধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিখ্যাত কবি আলেকজাণ্ডার পোপের কথা যে, সরকারের প্রকার ভেদ নিয়ে বোকারাই আলোচনা করে, প্রকৃতপক্ষে যে সরকার প্রশাসন কাজে সবচেয়ে দক্ষ সেই সরকারই সর্বশ্রেষ্ঠ---কথাটা সর্বজনবিদিত। যদিও কবি রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রসঙ্গে কথাটা বলেছিলেন কিন্তু আসলে এটা যে কোন সরকারের প্রশাসন যন্ত্রের সুষ্ঠুতার প্রতি যথেষ্ট ইংগিতপূর্ণ। সরকারী কার্যবিধি প্রশাসন যন্ত্রের একটি মূল সূত্র। বাংলাদেশ সরকারের কার্যবিধিও এই প্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা মহামান্য রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত। মহামান্য রাষ্ট্রপতি চার প্রকারে উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। কোনও কাজ হয়তো বা তিনি নিজে সম্পাদন করতে পারেন, আবার কোন কাজ তিনি উপ-রাষ্ট্রপতিকে করার দায়িত্ব দিতে পারেন,[১] কোন কাজ তিনি মন্ত্রী পরিষদের কোন সদস্যকে দিয়ে করাতে পারেন এবং কোন কাজ তিনি রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োজিত কোন ব্যক্তিকে দিয়েও করাতে পারেন। সংবিধানের প্রায় ৪৫টি স্থলে রাষ্ট্রপতির বিভিন্ন ক্ষমতার কথা উল্লিখিত আছে।[২] এর মধ্যে অবশ্য আইন পরিষদ ও বিচার বিভাগীয় সম্পর্কযুক্ত রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাবলীও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে কয়েকটি বিশেষ বিধি করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে—৫৬(৫) অনুঃ অনুযায়ী সরকারের কার্যবিধি প্রণয়ন; ৬২(২) অনুঃ অনুযায়ী জাতীয় সংসদ কর্তৃক আইন প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিরক্ষা সার্ভিসসমূহের এবং ১৩৩ অনুঃ অনুযায়ী সরকারী বেসামরিক কর্মচারীদের চাকুরী বিধিসমূহ প্রণয়ন;[৩] ৭৫ অনুঃ অনুযায়ী জাতীয় সংসদ প্রণয়ন না করা পর্যন্ত সংসদীয় পদ্ধতি নির্ণয়; ৭৯(৩) অনুঃ অনুযায়ী জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত স্পীকারের সাথে পরামর্শক্রমে জাতীয় সংসদের কর্মচারীদের চাকুরী বিধি প্রণয়ন; ৮৫ অনুঃ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় তহবিলের সংরক্ষণ, জমা ও খরচ সংক্রান্ত বিধিসমূহ প্রণয়ন; ১১৫ অনুঃ অনুযায়ী অধঃস্তন কোর্টসমূহে কার্য নির্বাহ পদ্ধতি নির্ধারণ ইত্যাদি। তাছাড়া সংবিধানের ১০৭ অনুঃ অনুযায়ী

সুপ্রীমকোর্টের কার্যনির্বাহ পদ্ধতি সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক প্রণীত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির অনুমোদন সাপেক্ষ। রাষ্ট্রের চুক্তি ও দলিলসমূহ কিভাবে সম্পাদিত হবে, ১৪৫ অনুঃ অনুযায়ী তাও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত হবে। বলাবাহুল্য উপরোক্ত বিধিমালার মধ্যে ৫৬(৫) অনুচ্ছেদ আরোপিত কার্যবিধিমালা রাষ্ট্রপতির একটি অন্যতম স্থায়ী ক্ষমতা এবং সম্ভবতঃ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

যদিও ১৯৭২ সালেই বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র রচিত হয়ে যায় তবুও দেখা যায় যে নভেম্বর, ১৯৭৫ এর পূর্বে কার্যবিধিমালা রচিত হয়নি। এর কারণ কি ? ঐ সময়কার রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করলে দেখা যায় যে সংবিধানের প্রকৃতি সম্পর্কে প্রথম কয়েক বছরে নিশ্চয়তা ছিল না। সংসদীয় গণতন্ত্র না রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতি-এ দুটার কোনটা প্রাধান্য পাবে তা নিয়ে রাজনীতিবিদদের মধ্যে যথেষ্ট দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। স্বাধীনতা ঘোষণায় রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতির ইংগিত ছিল।[৪] রচিত ও প্রণীত শাসনতন্ত্রে সংসদীয় পদ্ধতির প্রাধান্য ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীতে রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতি ও একদলীয় সরকারের প্রবর্তন হয়। রাজনৈতিক নিশ্চয়তা না থাকার কারণে হয়তো বা কার্যবিধি প্রণয়ন বিলম্বিত হয়েছিল।

যেহেতু বাংলাদেশ এক বিরাট সংগ্রামের পরে প্রতিষ্ঠিত হয় কাজেই বহুবিধ নতুন ধরণের সমস্যাদি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দেখা দেয়, যার সমাধান বা নীতি নির্ধারণ প্রশাসনিক কর্মকর্তা পর্যায়ে করা সম্ভবপর ছিল না। নীতি নির্ধারণী ক্ষেত্রে অনেক বিষয়েই পূর্ব নজির না থাকার কারণে বা অনিশ্চয়তার কারণে অনেক সাধারণ বিষয়েও সর্বোচ্চ রাষ্ট্রনায়কের মতামতের প্রয়োজন ছিল। ঐ সময়ে লেখক একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার নথিতে নিম্নোক্তভাবে দুটি সিদ্ধান্তের সম্মুখীন হয়েছিলেন ঃ

মাননীয় মন্ত্রী ঃ

"উপরোক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হইল।

তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য পেশ করা হইল।"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঃ

"কেবল অবগতি হইলেই চলিবে না, অনুমোদনেরও দরকার। অনুমোদিত হইল।"

উপরোক্ত নজির কার্যবিধির অবর্তমানেরই ফল ছিল কিন্তু সম্ভবতঃ এর অন্যরূপ উপায়ও ছিল না। অবস্থার প্রেক্ষিতে সেই সময় হয়ত বা সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ের সিদ্ধান্তের প্রয়োজন ছিল। উপরের স্তরে ঐ সময় অনেকে মনে করতেন যে কার্যবিধি প্রণীত হলে কার্য পরিচালনার নমনীয়তা ব্যাহত হবে। কার্যক্ষমতা বিধি-নিষেধ এর গণ্ডীর মধ্যে এসে সরকারী কার্যের দ্রুত নিষ্পত্তিতে ব্যাঘাত ঘটবে। একটি নূতন স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে এটা কাম্য নয় বলে

তাঁদের ধারণা ছিল। তবে এটা তর্ক সাপেক্ষ। কার্যবিধি প্রণীত হলে অনেক সিদ্ধান্তই সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হতো না।

তৃতীয়তঃ, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সে সময় দু'ধরণের আমলা বিরাজমান ছিলেন এবং অনেক প্রশাসনিক আমলারও স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজনৈতিক ভূমিকা ছিল। যাদের রাজনৈতিক ভূমিকা ছিল এবং যাদের ছিল না---তাঁদের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ব্যক্তিগত মর্যাদার মধ্যে তারতম্য বিদ্যমান ছিল। তাছাড়া প্রথমদিকে ধরে নেয়া হয়েছিল যে পুরানো ক্যাডার সার্ভিসসমূহ বিলোপ করা হবে---যেমন সি-এস-পি, ই-পি-সি-এস ইত্যাদি নামের শেষে লেখা প্রথম পর্যায়েই বাদ দেয়া হয়। বিভিন্ন শিল্প ও ব্যাংকসমূহ রাষ্ট্রীয়করণের সাথে সাথে সমাজতান্ত্রিক দেশের অনুকরণে রাজনৈতিক ক্যাডার সৃষ্টি করার চিন্তা ভাবনা করা হয়। তাছাড়া শিল্প ব্যবস্থাপনার জন্য একটি ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস সৃষ্টি হয় এবং ৬ মাসের জন্য ঐ সার্ভিসে নিয়োজিত শিক্ষানবীশগণকে সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়। এছাড়া ব্যাংক সমূহের প্রথম শ্রেণীর পদও সুপিরিয়র পোষ্টের অন্তর্ভুক্ত করতঃ সরকারী কর্মকমিশনের আওতাভুক্ত করা হয়।

কিন্তু জাতীয়করণ নীতির ফলস্বরূপ নতুন আমলা সৃষ্টির কারণে নতুন ধরণের সমস্যার সৃষ্টি হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ে ১০টি সেক্টর কর্পোরেশন স্থাপিত হওয়ার সাথে সাথে ১০ জন চেয়ারম্যানকে কোন সিদ্ধান্তের জন্য মন্ত্রী মহোদয়ের শরণাপন্ন হতে হতো। কথা হচ্ছিল যে সচিবের পদ উঠিয়ে দিয়ে প্রত্যেক চেয়ারম্যানকে সচিবের পদ মর্যাদা দেয়া হবে কিন্তু একজন মন্ত্রীর পক্ষে ১০ জনকে সমন্বয় করা প্রায় অসম্ভব ছিল।

অবশ্য বিভাগীয় প্রধান বা স্বায়ত্তশাসিত কর্তৃপক্ষসমূহের প্রধানদের মন্ত্রীদের সাথে সরাসরি যোগাযোগের নজির কোন কোন দেশে রয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের কথাই ধরা যাক মন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীর নীচের কর্মকর্তাকে বলা হয় 'ইন্সপেক্তার', যিনি একাধারে একটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব ও মহা-পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। কনটিনেন্টাল ইউরোপ বা মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে মহা-পরিচালকগণ সরাসরি মন্ত্রীর কাছে দায়ী থাকেন। লেবাননের মত একটি বহুজাতিক দেশেও এই ব্যবস্থা প্রচলিত। কনটিনেন্টাল ইউরোপীয় কোন কোন দেশ (যথা বেলজিয়ামে) প্রত্যেক মন্ত্রীর আবার একটি 'মিনিস্টিরিয়্যাল কেবিনেট' থাকে, এবং এর একজন Chief de cabinet থাকেন। তাঁরা রাজনীতিবিদ ও মন্ত্রী মহোদয়কে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

কিন্তু বাংলাদেশের প্রশাসনিক ঐতিহ্য ভিন্নরূপ। ব্রিটিশ ও পাক-ভারতীয় প্রশাসনিক পদ্ধতিতে মন্ত্রীকে সাহায্য করার জন্য একজন স্থায়ী সচিব থাকেন। হেনরী মেইন একদা বলেছিলেন ঃ It is the philosophy of government that the experts should be headed by the laymen'.

কথাটি যদিও অতিশয়োক্তি তবুও এটা অনস্বীকার্য যে অনেক ক্ষেত্রেই কোন মন্ত্রী প্রবীণ রাজনীতিবিদ হওয়া সত্বেও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতায় দুর্বল থাকেন, ফলতঃ তাঁকে একজন অভিজ্ঞ ও নিরপেক্ষ প্রশাসকের সাহায্য নিতে হয়। একটি মন্ত্রণালয়কে বিভিন্ন বিভাগ ও সংস্থার মধ্যে কাজের সমন্বয় করতে হয়; সংস্থা ও সরকারী বিভাগের মধ্যে প্রায়ই যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব থাকে তার ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়। প্রায়শঃ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত একটা বিচার কার্যের মতই। কথিত আছে, বিলাতে জনৈক রাজা বিচার কার্যের দায়িত্ব প্রধান বিচারপতির হাত থেকে নিজে গ্রহণ করতঃ পুনর্বার এই বলে ফেরত দিয়েছিলেন যে 'যখন আমি একপক্ষকে শুনি, আমার কাছে সব কিছুই পরিষ্কার হয়ে যায়, কিন্তু যখন আমি অন্য পক্ষকে শুনি, আমি তখন গোলমালে পড়ে যাই'।

এছাড়া একটা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের আন্তঃমন্ত্রণালয় অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টি-কোণ থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। একজন কৃষি সচিবের কেবলমাত্র কৃষি সম্পর্কিত জ্ঞান থাকাই যথেষ্ট নয়, তাঁকে সরকারের খাদ্য নীতি সম্পর্কে, ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে, কৃষি-শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কে, পানি সম্পদ সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হবে। তাছাড়া কৃষি এস্টেট বা অন্য কৃষি প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারী ভূমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত আইন কানুন তাঁর জানা থাকা দরকার। কৃষি বিজ্ঞানে তাঁর পার-দর্শিতা নিঃসন্দেহে উত্তম, কিন্তু তার চেয়েও বড়দিক হচ্ছে যে কৃষি অর্থনীতি, কৃষি পরিকল্পনা, কৃষি প্রশাসন তাঁর নখদর্পণে থাকা দরকার। অবশ্য এখানে জেনারেলিস্ট-স্পেশালিস্ট বিতর্ক না তোলাই ভাল, কারণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ফলে একজন স্পেশালিস্টও জেনারেলিস্ট হতে পারেন আর একজন জেনারেলিস্টও স্পেশালিস্ট হতে পারেন। তবে একজন সচিব অনেক জেনেও সব জান্তা হয়ে যেতে পারবেন না এবং এই কারণেই কার্যবিধিতে আন্তঃ মন্ত্রণালয় বা আন্তঃ বিভাগ আলোচনা ও মতামত বিনিময়ের প্রাধান্য রয়েছে।

কার্যবিধি বিশ্লেষণ করলে তাতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রাধান্য দৃষ্ট হয়ঃ

(১) নির্বাহী বিভাগের সংগঠন, দায়িত্ব ও কার্যবন্টন।
(২) রাষ্ট্রপতির এখতিয়ার।
(৩) মন্ত্রী পরিষদের এখতিয়ার।
(৪) কাউন্সিল কমিটির গঠন ও দায়িত্ব।
(৫) মন্ত্রী পরিষদ ও কাউন্সিল কমিটির সভা ব্যবস্থাপনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রণালী।
(৬) আন্তঃ মন্ত্রণালয় পরামর্শ।
(৭) নির্বাহী সরকারী কর্মচারীদের সাথে রাষ্ট্রপ্রধান ও মন্ত্রী মহোদয়দের সম্পর্ক।
(৮) কূটনৈতিক যোগাযোগ নীতিমালা।
(৯) রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা।

উপরোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে নির্বাহী বিভাগের সংগঠন, রাষ্ট্রপতির এখতিয়ার ও আন্তঃ মন্ত্রণালয় পরামর্শই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সাধারণভাবে সকল নির্বাহীর জন্য জ্ঞাতব্য।

নির্বাহী বিভাগের সংগঠন ও দায়িত্ব

কার্যবিধির প্রথম অধ্যায়ে ও ভিন্নভাবে প্রকাশিত তপশিল-১ এ কেন্দ্রীয় সরকারের কাঠামো ও দায়িত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। একটি দেশের সরকারের মূল কাঠামো যদিও সংবিধানে দেখা যায়, কিন্তু সরকারের নির্বাহী বিভাগের পূর্ণাংগ কাঠামো, স্তর বিন্যাস ও কর্মবন্টন কার্যবিধিতে দেয়া থাকে। এ প্রসঙ্গে বিধি ৩(২) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিধি মোতাবেক তপশিল-১ দ্বারা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ-এর মধ্যে কর্মবন্টন করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের তালিকাও এ তপশিলে পাওয়া যায়। সংবিধানে এ তালিকা নেই। একজন সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম-সচিব, উপ-সচিব বা সহকারী সচিব যথার্থভাবে সমগ্র সরকারের মুখপাত্র। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের একজন সহকারী সচিবও সমগ্র বাংলাদেশ সরকারের সহকারী সচিব। তবে বিভিন্ন বিধি, প্রবিধি ও আদেশ দ্বারা তাঁর দায়িত্বকে নির্দিষ্ট করা হয়। তন্মধ্যে উপরে বর্ণিত তপশিল-১ এবং মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব 'লেভেল অফ ডিসপোজাল' উল্লেখ্য।

যেহেতু কার্যবিধি শাসনতন্ত্রের আওতায় রচিত এবং কার্যবিধির তফশিল-১ কার্যবিধিরই অংশ কাজেই মন্ত্রণালয় ও বিভাগের তালিকা এবং এর কর্মবন্টনের পূর্ণ আইনগত সত্তা রয়েছে। এ সম্পর্কে সাবেক পাকিস্তান আমলের একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান রচিত পাকিস্তানের ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র তখন আমলে এসেছে এবং তার আওতায় ১৯৬২ সালের কার্যবিধি রচিত হয়েছে। জনাব গোলাম ফারুক তখন সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর। ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে ছিল যে কেন্দ্রীয় সরকারের যতটা বিভাগ আছে তার বেশী কেন্দ্রীয় সরকার পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নিতে পারবেন না, আর প্রাদেশিক সরকারের যতটা ডিপার্টমেন্ট আছে, তার বেশী প্রদেশে পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নেয়া যাবে না।[৫] গভর্ণর গোলাম ফারুক সম্ভবতঃ সরকারী দল অর্থাৎ কনভেনশন মুসলিম লীগে ভাঙ্গন রোধ করার জন্যে পূর্ব পাকিস্তানে ৩০ জন পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নেন। কিন্তু তখন পূর্ব পাকিস্তানে ডিপার্টমেন্ট ছিল মাত্র প্রায় ১৬টি। দেখা গেল যে এটা অশাসনতান্ত্রিক হয়ে গেছে, অথচ পার্লামেন্টারী সেক্রেটারীর সংখ্যা কমানো যাবে না রাজনৈতিক কারণে। কাজেই ঐ ১৬টি ডিপার্টমেন্টকে ভেঙ্গে ৩০টি বানাতে হলো। স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজ কল্যাণ একটি ডিপার্টমেন্ট ছিল, ভেঙ্গে তিনটি ডিপার্টমেন্ট করা হলো। কিন্তু সমস্যা দাঁড়ালো যে এতগুলো ডিপার্টমেন্ট এর এত সচিবই বা পাওয়া যায় কোথা থেকে আর তার খরচাই বা কুলানো যাবে কিভাবে? এর সমাধান করা হলো অতি সহজভাবে। বলা হলো যে, ডিপার্টমেন্ট ৩০টা হলো বটে, কিন্তু

উপরোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে নির্বাহী বিভাগের সংগঠন, রাষ্ট্রপতির এখতিয়ার ও আন্তঃ মন্ত্রণালয় পরামর্শই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সাধারণভাবে সকল নির্বাহীর জন্য জ্ঞাতব্য।

নির্বাহী বিভাগের সংগঠন ও দায়িত্ব

কার্যবিধির প্রথম অধ্যায়ে ও ভিন্নভাবে প্রকাশিত তপশিল-১ এ কেন্দ্রীয় সরকারের কাঠামো ও দায়িত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। একটি দেশের সরকারের মূল কাঠামো যদিও সংবিধানে দেখা যায়, কিন্তু সরকারের নির্বাহী বিভাগের পূর্ণাংগ কাঠামো, স্তর বিন্যাস ও কর্মবন্টন কার্যবিধিতে দেয়া থাকে। এ প্রসঙ্গে বিধি ৩(২) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিধি মোতাবেক তপশিল-১ দ্বারা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ-এর মধ্যে কর্মবন্টন করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের তালিকাও এ তপশিলে পাওয়া যায়। সংবিধানে এ তালিকা নেই। একজন সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম-সচিব, উপ-সচিব বা সহকারী সচিব যথার্থভাবে সমগ্র সরকারের মুখপাত্র। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের একজন সহকারী সচিবও সমগ্র বাংলাদেশ সরকারের সহকারী সচিব। তবে বিভিন্ন বিধি, প্রবিধি ও আদেশ দ্বারা তাঁর দায়িত্বকে নির্দিষ্ট করা হয়। তন্মধ্যে উপরে বর্ণিত তপশিল-১ এবং মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব 'লেভেল অফ ডিসপোজাল' উল্লেখ্য।

যেহেতু কার্যবিধি শাসনতন্ত্রের আওতায় রচিত এবং কার্যবিধির তফশিল-১ কার্যবিধিরই অংশ কাজেই মন্ত্রণালয় ও বিভাগের তালিকা এবং এর কর্মবন্টনের পূর্ণ আইনগত সত্বা রয়েছে। এ সম্পর্কে সাবেক পাকিস্তান আমলের একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান রচিত পাকিস্তানের ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র তখন আমলে এসেছে এবং তার আওতায় ১৯৬২ সালের কার্যবিধি রচিত হয়েছে। জনাব গোলাম ফারুক তখন সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর। ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে ছিল যে কেন্দ্রীয় সরকারের যতটা বিভাগ আছে তার বেশী কেন্দ্রীয় সরকার পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নিতে পারবেন না, আর প্রাদেশিক সরকারের যতটা ডিপার্টমেন্ট আছে, তার বেশী প্রদেশে পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নেয়া যাবে না।[৫] গভর্ণর গোলাম ফারুক সম্ভবতঃ সরকারী দল অর্থাৎ কনভেনশন মুসলিম লীগে ভাঙ্গন রোধ করার জন্যে পূর্ব পাকিস্তানে ৩০ জন পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নেন। কিন্তু তখন পূর্ব পাকিস্তানে ডিপার্টমেন্ট ছিল মাত্র প্রায় ১৬টি। দেখা গেল যে এটা অশাসনতান্ত্রিক হয়ে গেছে, অথচ পার্লামেন্টারী সেক্রেটারীর সংখ্যা কমানো যাবে না রাজনৈতিক কারণে। কাজেই ঐ ১৬টি ডিপার্টমেন্টকে ভেঙ্গে ৩০টি বানাতে হলো। স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজ কল্যাণ একটি ডিপার্টমেন্ট ছিল, ভেঙ্গে তিনটি ডিপার্টমেন্ট করা হলো। কিন্তু সমস্যা দাঁড়ালো যে এতগুলো ডিপার্টমেন্ট এর এত সচিবই বা পাওয়া যায় কোথা থেকে আর তার খরচাই বা কুলানো যাবে কিভাবে? এর সমাধান করা হলো অতি সহজভাবে। বলা হলো যে, ডিপার্টমেন্ট ৩০টা হলো বটে, কিন্তু

সংস্থাপন ব্যবস্থা পূর্ববৎ থাকবে। অর্থাৎ 'স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজ কল্যাণ' পূর্ববৎ একই সচিবের অধীনে থাকবে তবে 'ডিপার্টমেন্টস্' বলতে হবে। বলাবাহুল্য এভাবেই এ সম্পর্কে শাসনতান্ত্রিক সংকট কাটানো হলো।

সাবেক পাকিস্তান সরকারের কার্যবিধির অনুকরণে বাংলাদেশ সরকারের কার্যবিধিতেও সচিব পদের প্রাধান্য রয়েছে। তবে মন্ত্রীর কি কাজ তাও কার্য-বিধিতে বর্ণিত রয়েছে। কার্যবিধি অনুযায়ী মন্ত্রীর কাজ প্রধানতঃ চারটি ঃ

(১) তিনি রাষ্ট্রপতিকে নীতি নির্ধারণে সাহায্য ও পরামর্শ দান করবেন।

(২) তিনি তাঁর মন্ত্রণালয়ের/বিভাগের নীতি ও তার বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকবেন।

(৩) আইন পরিষদে তিনি তাঁর মন্ত্রণালয়ে/বিভাগ-এর কাজের জন্য দায়ী থাকবেন।

(৪) রাষ্ট্রপতিকে তিনি তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত রাখবেন।

রাষ্ট্রপতি আইন পরিষদের দায়িত্ব থেকে মন্ত্রীকে অব্যাহতিও দিতে পারেন। বলাবাহুল্য ১৯৭২ সনের সংবিধান অনুযায়ী মন্ত্রী সভার কোন কোন সদস্য জাতীয় সংসদের সদস্য নাও হতে পারেন এবং রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাধীনেই তাঁদেরকে নিয়োগ ও অপসারণ করা হয়।

পক্ষান্তরে কার্যবিধিতে সচিবের চারটি প্রধান দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

(১) তিনি মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর দাপ্তরিক প্রধান হিসাবে গণ্য হবেন এবং এর প্রশাসন, শৃঙ্খলা এবং অর্পিত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য দায়ী থাকবেন।

(২) তিনি স্বীয় মন্ত্রণালয়, সংযুক্ত বিভাগসমূহ এবং অধঃস্তন অফিসসমূহের মুখ্য হিসাব কর্মকর্তা। তাঁকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন তহবিল অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিধিমালা ও অন্যান্য চালু আইন মোতাবেক খরচ হয়।

(৩) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে মন্ত্রণালয়/বিভাগের কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত রাখা এবং তাঁর হস্তক্ষেপের বাইরে যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ নেয়া হয়েছে তা জানানোও সচিবের দায়িত্ব।

(৪) বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের প্রধানদের সাথে পত্রযোগাযোগ রক্ষা করা।

দাপ্তরিক প্রধান হিসাবে সচিব যে কেবল মন্ত্রণালয় বা বিভাগ এর শাখাসমূহ এবং বিভিন্ন স্তরের কার্যাবলী নির্ধারণ করেন তাই নয়, শৃঙ্খলা ও আপীল বিধির আওতার নির্দেশমালা অনুযায়ী (সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি নং ME (Regn-U)

1D-11/86-74 তারিখ ঃ ২৪-৬-৮৬ ইং) যেখানে রাষ্ট্রপতি নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সে ক্ষেত্রেও সর্বশেষ এম,এন,এস, বেতন ধাপ টাঃ ৫২৫০।-এর নীচ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সচিবই পালন করবেন। এক্ষেত্রে মন্ত্রীর প্রত্যক্ষভাবে কিছু করণীয় নাই, সচিবের মাধ্যমে অথবা স্বয়ং রাষ্ট্রপতির নির্দেশ নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ১৯৮৫ সালের সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালার ৬ নং বিধিতে নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ

......the authority or in cases where the President is the authority, the Secretary of the Administrative Ministry or Division to which the Government servant belongs or such officer as the authority or the Secretary of the Administrative Ministry or Division may, by general or special order, specify in this behalf....

মুখ্য হিসাব কর্মকর্তা হিসাবে সচিবের দায়িত্ব অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত Revision of Delegation of Financial Powers to the Ministries/Divisions, 1983-তে বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

The Secretary-in-charge (which term shall be deemed to include Acting/Additional Secretary or Joint Secretary-in-charge) of Ministry/ Division shall continue to be the Principal Accounting Officer of his Ministry/Division, its attached Departments and subordinate offices in respect of receipts as well as expenditure incurred from the budget grants controlled by his Ministry/Division.

He shall be responsible for ensuring that :—

(a) funds allocated to his Ministry/Division, its attached Departments or subordinate offices are spent for the purpose for which th ey are allocated ;

(b) the funds are spent strictly in accordance with the rules and regulations, and the expenditure is not, prima-facie, more than the occasion demands and that every Government servant exercises the same vigilance in respect of expenditure incurred from public funds as a person of ordinary prudence would exercise in respect of expenditure of his own money ;

(c) actual expenditure does not exceed the sanctioned budget allocation made for the respective items/sub-heads, etc., ;

(d) no expenditure is incurred in anticipation of authorisation of an annual Budget/Supplementary grants, without the prior concurrence of the Ministry of Finance ;

(e) all payments and receipts are correctly classified under appropriate heads of accounts and the Departmental

Accounts are reconciled every month with the figures communicated by the Accountant General and Accounts Officer. In respect of Ministries/Divisions whose accounts have been 'departmentalised', the Chief Accounts Officer will regularly reconcile his accounts with those of attached Departments/ Subordinate Offices ;

(f) audit objections are promptly settled.

মন্ত্রীকে মন্ত্রণালয়/ডিভিশন এর কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত রাখাও সচিবের একটি প্রধান দায়িত্ব। কারণ মন্ত্রণালয়/ডিভিশনের কাজকর্ম সম্পর্কে মন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় সংসদের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। সাবেক পাকিস্তানের কার্যবিধি ১৯৬২-তে মন্ত্রীর সাথে সচিবের কোনও বিষয়ে মতানৈক্য হলে রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করার ব্যবস্থা ছিল (বিধি ৪(৮)(এ)। রাষ্ট্রপতির অবর্তমানে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর বা সচিবের মধ্যে মতানৈক্য হলে সচিবকে বিষয়টি রাষ্ট্রপতি না দেখা পর্যন্ত স্থগিত রাখার বা জরুরী অবস্থায় মন্ত্রী পরিষদে দেয়ার নির্দেশ ছিল (বিধি ৪(৮)(বি)। এমনকি রাষ্ট্রপতির অবর্তমানে কোন জরুরী গুরুত্বপূর্ণ নীতি পরিবর্তন অপরিহার্য হলে রাষ্ট্রপতির মুখ্য সচিবের সাথে পরামর্শের নির্দেশ ছিল (বিধি ৪(২) বি)। উপরোক্ত বিষয়গুলো বাংলাদেশ সরকারের কার্যবিধিতে রাখা হয়নি। সম্ভবতঃ এগুলো রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিপন্থী বলেই তা বাদ দেয়া হয়েছে।

স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে সচিবালয়ের দায়িত্ব ১৯৭৬ সালে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত Guidelines on the Relationship between Government and Autonomous Bodies/Corporations....এর ৪নং অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ

(a) The functions of the Ministry are confined to policy-making, appointment of Chairman/Directors/Members, approval of budget, appointment of Auditors and review of audit reports, evaluation of performance and such other matters as may be prescribed in the relevant laws, rules and regulations ;

(b) the functions of a Corporation are confined to its smooth and efficient operations, within the limits of respective laws, rules and regulations, and

(c) the Corporation shall submit performance report periodically **in such** form as may be prescribed by the Government.

সচিবালয় ঃ

কার্যবিধিতে ডিভিশন বা মন্ত্রণালয় সমূহের দপ্তরসমূহকে সমষ্টিগতভাবে 'সচিবালয়' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে (বিধি ২(১)(ক)। প্রশাসনিক ঐতিহাসিকদের

দৃষ্টিকোণে বিভিন্ন এলাকার সুপারভাইজারদের থেকে প্রাপ্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজস্ব ও অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে বড়লাটকে সাহায্য করার জন্য বড়লাটের অফিসে একজন 'চীফ ক্লার্ক' নামক অফিসার পদ সৃষ্টি করা হয়। এ পদই পরবর্তীতে চীফ সেক্রেটারী বা মুখ্য সচিবরূপে বিবর্তিত হয় এবং তাঁর দপ্তরকে 'সচিবালয়' রূপে আখ্যায়িত করা হয়। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানী আমলে প্রদেশে চীফ সেক্রেটারী পদ ছিল। বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার পর উক্ত পদ বিলুপ্ত হয় এবং প্রধানমন্ত্রীর 'প্রধান সচিব' সাময়িকভাবে এর দায়িত্ব পালন করেন এবং পরে তাও বিলুপ্ত হয়। পাকিস্তানী আমলে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যেক মন্ত্রণালয় বা ডিভিশন এর দায়িত্বে এক এক জন সচিব ছিলেন এবং সচিব কমিটি একটি আনুষ্ঠানিক কমিটি হিসাবে চিহ্নিত ছিল (সাবেক পাকিস্তান সরকারের ১৯৬২ সালের কার্যবিধির ৮(৮) নং বিধি)। বাংলাদেশ সরকারের কার্যবিধিতে অবশ্য ঐ ধরনের কোন কমিটির ব্যবস্থা নাই। তবে বিভিন্নভাবে সচিবরা সরকারের বিভিন্ন কমিটিতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। উভয় কার্যবিধিতে অবশ্য সচিবকে দাপ্তরিক প্রধান বলা হয়েছে।

কার্যবিধি অনুযায়ী সচিবালয় প্রধানতঃ একটি 'ষ্টাফ' দপ্তর। কার্যবিধির ৪ (১২) বিধিতে বলা হয়েছে ঃ

The role of the Secretariat shall be limited to :—

(a) policy formulation ;

(b) planning ;

(c) evaluation of execution of plans ;

(d) legislative measures ;

(e) assisting the Minister in the discharge of his responsibilities to the Parliament;

(f) personnel management at the top level, viz.

(i) officers not below the rank of Member/Director in the cases of public statutory corporations ; and

(ii) officers not below the level of National Grade V in the cases of attached Departments and Subordinate offices; and

(g) such other matter/matters as may be determined by the President from time to time.

সচিবালয় মুখ্যতঃ নির্বাহী প্রতিষ্ঠান নয়, বরং রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির পক্ষে কাজ করাই সচিবালয়ের দায়িত্ব। রাষ্ট্রপতির আদেশ, নিষেধ, নির্দেশাবলী ইত্যাদি সচিবালয়ের কর্মকর্তারা রাষ্ট্রপতির পক্ষে বিভিন্ন নির্বাহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সমূহে দিয়ে থাকেন বা রাষ্ট্রপতির পক্ষে দলিলাদি সম্পাদন করে থাকেন। কার্যবিধির ২নং তফশিল অনুযায়ী নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ রাষ্ট্রপতির পক্ষে কাজ করতে পারেন ঃ

1. Principal Secretary to the President, Secretary, Joint Secretary, Deputy Secretary, Asstt. Secretary to the Government of the People's

Republic of Bangladesh or an officer who is granted one of these ranks ex officio, or Director-General, Director, President's Secretariat Public Division or an Officer on Special Duty duly authorised by the Ministry concerned.

2. In respect of the matters within their jurisdiction :—

(a) Controller or Deputy Controller of Capital Issues, [Financial Adviser, Joint Financial Adviser, Deputy Financial Adviser or Assistant Financial Adviser].

(b) Director-General or Deputy Director General Bangladesh Post Office Department, and Director or Deputy Director-General or Chief Engineer, Bangladesh Telegraph and Telephone Department.

(c) Omitted.

(d) Other officers of Agencies/Departments of the Government as may be notified by the Government from time to time.

3. Military Secretary to the President or Assistant Secretary in the President's Secretariat.

4. Any other officer authorised as such by the respective Ministry after due consultation with the Cabinet Division.

অবশ্য রাষ্ট্রপতি বা সরকারের পক্ষে কাজ করার ক্ষমতা কেবল কার্যবিধিতেই সীমাবদ্ধ নয়। দেশের প্রচলিত বিভিন্ন আইনেও সে ক্ষমতা অর্পিত আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৯০৮ সনের Civil Procedure Code এর ৮০ (১) নং ধারায় সরকারের বিরুদ্ধে মামলার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ সরকারী প্রতিনিধিত্ব বর্ণিত আছে ঃ

A suit may be instituted against the Government or against a public officer, in respect of any act purporting to be done by such public officer in his official capacity, after the expiration of two months next after notice in writing has been delivered to or left at the office of :—

(i) in the case of a suit against the Government other than a suit relating to the affairs of the Railway, a Secretary to the Government or the collector of the District ; and

(ii) in the case of a suit against the Government relating to the affairs of the Railway, the General Manager of the Railway.

কার্যবিধির ২(১) (জে) বিধি অনুযায়ী 'সচিব' বলতে সচিব, ভারপ্রাপ্ত সচিব অথবা একটি মন্ত্রণালয়ের বা ডিভিশনের দায়িত্বে নিয়োজিত অতিরিক্ত সচিব বা যুগ্ম-সচিবকেও বুঝায়। কিন্তু কোন উপ-সচিব বা সহকারী সচিব-এর উল্লেখ এতে

নেই। অর্থাৎ যুগ্ম-সচিবের নীচে কেউ কোন মন্ত্রণালয় বা ডিভিশনের দাপ্তরিক প্রধান হতে পারবেন না। যদি একজন যুগ্ম-সচিবও না থাকেন তাহলে হয় অন্য মন্ত্রণালয় বা ডিভিশনের কোন সচিব বা অতিরিক্ত সচিব বা যুগ্ম-সচিব-এর দায়িত্বে থাকেন অথবা ঐ মন্ত্রণালয় বা ডিভিশনের কোন উপ-সচিবকে চলতি দায়িত্ব দিয়ে যুগ্ম-সচিব করে সচিবের দায়িত্ব দেয়া হয়। বলাবাহুল্য ১৮৯৭ সালের General Clauses Act এর ১৯(১) ধারা অনুযায়ী কোনও দাপ্তরিক প্রধানের পরিবর্তে আইন সম্মতভাবে অন্য কোনও অধীনস্থ ব্যক্তিও তাঁর দায়িত্ব পালন করলে দাপ্তরিক প্রধান বলেই তিনি আইনের চোখে গণ্য হবেন।

কার্যবিধিতে সচিবের যেসব দায়িত্বের উল্লেখ রয়েছে মোটামুটিভাবে তা নিম্নরূপ ঃ

Rule 3(v) : The Secretary shall organise the Division into a number of working units to be known as sections :

Provided that a unit which does not conform to a section may be organised otherwise than as a section in consultation with the Ministry of Establishment.

Rule 3(vi) : The Secretary shall, by means of standing orders, distribute the work of the Division among the various sections or other units of the Division under his charge.

Rule 4(vii) : The Secretary shall be official head of the Ministry/Division and subject to sub-rule(iv) he shall be responsible for its administration and discipline and for the proper conduct of business assigned to it.

Rule 4 (viii) : The Secretary shall also be the Principal Accounting Officer of his Ministry, its Attached Departments and Subordinate Offices, and ensure that funds controlled by him are spent in accordance with the rules laid down by the Ministry of Finance, or any other law for the time being in force.

Rule 4(ix) : The Secretary shall keep the Minister-in-charge generally informed of the working of the Ministry/Division and of any important cases disposed of without reference to him or the Minister of State/Deputy Minister.

Rule 6(ii) : Secretaries shall remain personally responsible to see that the instructions noted above are fully observed.

Rule 17(1) : In respect of all cases to be submitted to the Council, the Secretary of the Ministry concerned shall transmit to the Cabinet Secretary a concise and clear memorandum of the case, hereinafter referred to as the 'Summary' giving the background and relevant facts, the points for decision and the recommendations of the Minister-in-charge. The summary shall include as appendices such relevant papers as may be necessary for the proper appreciation of the case. The number of sets of the summary to be supplied shall be specified by the Cabinet Secretary.

Rule 19(6) : If the Secretary of the Ministry concerned considers that the discussion on a case should await the return of the Minister-in-charge, he may request the Cabinet Secretary for its postponement until the return of the Minister. The Cabinet Secretary shall thereupon obtain the direction of the President in regard to such postponement.

Rule 21(2) : The Secretary of the Ministry concerned shall, on receipt of the Council decision, communicate it to the officials concerned, but shall not forward the original document. The decision shall be formally conveyed as decision of the Government and details as to the Ministers present at the meeting of the Council/Committee of the Council, shall not be disclosed.

Rule 21(3) : To ensure implementation of the Council decisions, the Secretary of each Ministry shall keep a record of all the decisions conveyed to him and shall watch progress of action. It shall be his responsibility, as Secretary of the Ministry sponsoring the summary, to consult or inform any other Ministries concerned.

Rule 22(3) : The Secretaries shall retain the Council decision conveyed to them under rule 19(8) in their custody, and shall make them over to their successors at the time of handing over charge.

Rule 29(1) : The Secretary shall, in respect of Ministries in his charge be responsible for the careful observance of these Rules and where he considers that there has been any material departure from them, he shall bring the matter to

the notice of the Minister-in-charge and; if necessary the Cabinet Division.

উপরোক্ত বিধিসমূহের প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, সচিবগণ সরকারের নির্বাহী শাখার তথা মন্ত্রণালয়/ডিভিশনসমূহের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। **সচিবালয় নির্দেশমালা** ১৯৭৬ অনুযায়ী সরকারের সংযুক্ত দপ্তর, অধঃস্তন অফিস এবং বিভিন্ন সংবিধির বলে সরকার কর্তৃক গঠিত স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থ সমূহের মধ্যে সরকারী বিষয়াদির ক্ষেত্রে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে সংশ্লিষ্টা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বা ডিভিশনই কাজ করবে। (বিধি ১৬৮-ক)।

তাছাড়া নিম্নোক্ত সংস্থাসমূহ ব্যতীত সরকারী কোন সংযুক্ত দপ্তর বা অধঃস্তন অফিস, মন্ত্রণালয়/ডিভিশনের মাধ্যম ব্যতীত আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ে কোন বিষয়াদি অনানুষ্ঠানিকভাবে প্রেরণ করবে না। ব্যতিক্রমধর্মী সংস্থাগুলি হচ্ছে (বিধি ১৭৩)ঃ

(ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।
(খ) ডাক বিভাগ।
(গ) তার ও টেলিফোন বিভাগ।
(ঘ) জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা।
(ঙ) যে সকল দপ্তরের প্রধানগণ পদাধিকার বলে সচিবালয়ের কর্মকর্তার মর্যাদাপ্রাপ্ত সেই সকল দপ্তর।

দপ্তর ও তার প্রধানদের সাথে মন্ত্রণালয়ের সম্পর্ক সম্পর্কে সচিবালয় নির্দেশমালায় নিম্নরূপ বর্ণিত আছে ঃ

১৭৯। কোন দপ্তরের প্রধান সাধারণতঃ কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ পত্রে প্রস্তাবাবলী প্রেরণ করিবেন এবং উহাতে বিষয়টির তথ্যাবলী, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধারাসমূহ এবং তাঁহার সুনিদিষ্ট সুপারিশসমূহ বর্ণিত হইবে।

১৮০। দপ্তর প্রধানগণ তাহাদের স্ব স্ব প্রস্তাবসমূহের টেকনিক্যাল নির্ভুলতার জন্য দায়ী থাকিবেন এবং সাধারণতঃ এই সকল প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক কোনরূপ টেকনিক্যাল পরীক্ষার আওতায় আসিবে না।

১৮১। কোন দপ্তর প্রধান যে-সব বিষয় সম্পর্কে নিজে আদেশ দানের যোগ্য নহেন, কেবলমাত্র সেই সকল বিষয়ই মন্ত্রণালয়/বিভাগে পেশ করিবেন। যে বিষয় নিষ্পত্তি করার যোগ্যতা তাঁহার নিজেরই রহিয়াছে, সেইরূপ কোন বিষয় মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরিত হইলে, তাহা কোনরূপ পরীক্ষা ব্যতিরেকেই তাঁহার নিকট ফেরৎ দেওয়া হইবে।

১৮২। কোন দপ্তর প্রধানের স্বাক্ষরে মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরিত কোন বিষয়, বৃহৎ দপ্তরসমূহের ক্ষেত্রে সচিব, অতিরিক্ত সচিব বা

যুগ্ম-সচিবের সমক্ষে, অথবা যে সকল দপ্তরের প্রধান মোটা-মুটি উপ-সচিবের সম-মর্যাদাসম্পন্ন, সেই সকল ক্ষুদ্র দপ্তরের ক্ষেত্রে উপ-সচিবের সমক্ষে উপস্থাপন করা হইবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উক্ত প্রেরিত বিষয়ে সরাসরি আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন কিনা দেখিবেন। পূর্ববর্তী কাগজপত্রাদির প্রয়োজন বা নিম্নতর পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইলে, তদনুসারে নির্দেশাবলী প্রদান করা হইবে। তবে মূল নথির পরিবর্তে কোন ছায়া নথিতেই এই ধরণের নিরীক্ষা চালানো উচিত এবং এইরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা কার্যে ভদ্র ও নম্র ভাষা ব্যবহার করা উচিত।

১৮৩। সচিবালয় কর্তৃক কোন দপ্তরের প্রাত্যহিক কার্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইবে না। মতানৈক্যের ক্ষেত্রে কোন দপ্তর প্রধানকে মন্ত্রীগণের সহিত সরাসরি পরামর্শ করার সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে। কার্যপরিচালনা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে দপ্তর প্রধান প্রয়োজন মনে করিলে সরাসরিভাবে মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিতে পারিবেন। অতঃপর তিনি সচিবকে এতদ্-সম্পর্কে অবহিত করিবেন।

বাংলাদেশ সরকারের কার্যবিধি বস্তুতঃ সরকারী নির্বাহী ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে একটি সমঝোতা। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী-পরিষদ ও মাননীয় মন্ত্রীবর্গ ও সচিবগণ এবং দপ্তর প্রধানগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব, কর্তব্য ও পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ। একটি রাষ্ট্রের কাজকর্ম কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এককভাবে সমাধা করা সম্ভবপর নয়। তার জন্য প্রয়োজন একটি সমষ্টিগত প্রচেষ্টা। বাংলাদেশ সরকারের কার্যবিধি সেই সমষ্টিগত প্রয়াসেরই দিক নির্দেশ করে। তবে রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতার বিন্যাস কেবলমাত্র কার্যবিধিতেই সীমাবদ্ধ নয়। দেশের বিভিন্ন আইন ও বহুবিধ বিধি, প্রবিধি, উপবিধি ইত্যাদিতে ইহা ছড়িয়ে আছে।[৩]

টীকা

১. সংবিধানের ৫৬ (২) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতি তাঁর আদেশের দ্বারা কোন কোন বিষয়ে উপ-রাষ্ট্রপতিকে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রয়োগ করা 'নির্ধারণ' করতে পারবেন বলে বলা হয়েছে।

২. সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছদগুলো হচ্ছে ৩০ (২), ৩০(৩), ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬১, ৬২, ৬৪, ৬৮, ৭২, ৭৩, ৭৫, ৭৯(৩), ৮২, ৮৫, ৮৯(৩), ৯১, ৯৩, ৯৫, ৯৬(৬), ৯৭, ৯৮, ১০০, ১০৬, ১০৭(১), ১১৫, ১১৮(১), ১১৮(৫), ১২০, ১২৭(১), ১২৭(২), ১২৮(৩), ১২৯(২), ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৫(২) (৩), ১৩৮, ১৩৯(২), ১৪১ এ, ১৪১ সি, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৫এ, ১৪৭(১) বি ইত্যাদি।

৩. সরকারী কর্মচারীদের চাকুরীবিধি প্রণয়নের দায়িত্ব সংবিধানের ১৩৩ অনুঃ অনুযায়ী জাতীয় সংসদের। তবে জাতীয় সংসদ এ সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন না করা পর্যন্ত রাষ্ট্রপতিকে সংবিধানে এ বিষয়ে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তবে পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের নং ঃ পিএস/পিএসএস/V৪/৭৮-৮৫৩(১৫০), তাং ঃ ৩-১১-১৯৭৮ ইং এ উপ-রাষ্ট্রপতিকে সরকারী কার্যবিধির ৬(III), ১৬(৬), ২৪(৪) এবং ৩ নং তপসিলের ৩, ১৬, ১৭, ২৪ ; কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণ, হরতাল বিষয়সহ সরকারী কর্মচারীদের মামলাসমূহের দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপতিকে 'ডেলিগেট' করা হয় এবং পরে গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে (নং ঃ পিএস/অ্যাডমিন/৮(২৪)/৭৮–১৫৬৯, তাং ২০-১১-৭৮ ইং) ১৩৩ অনুঃ সংক্রান্ত পূর্ণ দায়িত্ব 'ডেলিগেট' করা হয়। বলাবাহুল্য সংবিধানে 'নির্ধারণ' শব্দটির উল্লেখ রয়েছে।

৪. স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র মুজিবনগর, তাং ১০ ইং এপ্রিল, ১৯৭১ এর ১২–১৩ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। কিন্তু অস্থায়ী সাংবিধানিক আদেশ, ১৯৭২, তাং ঃ ১১ই জানুয়ারী, ১৯৭২ ইং এর ৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল যে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী সকল কর্ম সম্পাদন করবেন।

৫. সাবেক পাকিস্তান সরকারের ১৯৬২ সালের সংবিধানের ৩৫ ও ৮৪ ধারা দ্রষ্টব্য।

৬· প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, একদা রেলবিভাগের অবসরপ্রাপ্ত লাইনম্যানদের চুক্তি ভিত্তিক চাকরী কোন কর্তৃপক্ষের আদেশে নিয়মসিদ্ধ হবে এ নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিল, কারণ কার্যবিধির ৩য় অধ্যায়ে রেল বিভাগের জন্য কিছু ব্যতিক্রমের অনুমতি আছে। দৃশ্যতঃ রেলবিভাগের সচিব স্বাক্ষর প্রদান করলেই চলবে বলে অনেকে মনে করলেন। কিন্তু পরে দেখা গেল যে ১৯৭৪ সালের গণকর্মচারী (অবসর) আইন এর ৫(৩) ধারা অনুযায়ী অবসরপ্রাপ্ত যে কোন সরকারী কর্মচারীর পুণর্বহাল রাষ্ট্রপতির এখতিয়ারভুক্ত, যদিও কার্যবিধিতে তার বিশদ উল্লেখ নেই। বলাবাহুল্য, দেশের কোন প্রচলিত আইনের সাথে কখনও কার্যবিধির কোনও বিষয়ের অসামঞ্জস্যতা দেখা দিলে বিষয়টি মন্ত্রীপরিষদ বিভাগেই ব্যাখ্যার জন্য প্রেরণ করতে হয়। প্রয়োজনবোধে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ আইন মন্ত্রণালয়ের সাথে এ সম্পর্কে পরামর্শ করবেন।

বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচী : একটি সমীক্ষা

নাসিরউদ্দীন আহমেদ

ভূমিকা

সাম্প্রতিক কালে স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনার ধারণা ও ব্যবহার তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছে। এটা শুধুমাত্র উন্নয়নের গতিধারা ত্বরান্বিত করার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয় না বরং উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে। স্থানীয় সরকার এই পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের চাহিদা, এলাকার নির্দিষ্ট তারতম্য, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে সম্পদ বিভাজনের প্রয়াস পায়। স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাস করা এই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য। এর প্রধান উপাদানগুলো হলো (১) স্বশাসন ; (২) স্বতঃস্ফূর্ততা ও (৩) জনগণের অংশগ্রহণ।[১] উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও উন্নয়নের সুফল ভোগ করাকে জনগণের অংশ গ্রহণ বুঝানো হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনার মাধ্যমে 'গ্রাম প্রজাতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন।[২] 'গ্রাম প্রজাতন্ত্র' বলতে তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বশাসিত গ্রামকে বুঝাতে চেয়েছেন।

বাংলাদেশে চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার বিরাজমান : (১) জেলা পরিষদ, (২) উপজেলা পরিষদ, (৩) ইউনিয়ন পরিষদ ও (৪) পৌরসভা/পৌরকর্পোরেশন। বর্তমান নিবন্ধে উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এর প্রধান কারণ হলো এই যে সম্প্রতি জাতীয় সরকার কর্তৃক প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলে উপজেলা সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়েছে। ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে সরকার উন্নয়নের সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছিয়ে দেবার মানসে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া শুরু করেন। এ উদ্দেশ্যে ৪৬০টি উপজেলা সৃষ্টি করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে উন্নয়ন ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একটি নুতন পদক্ষেপ।[৩] উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়ার সমযোগে বিকেন্দ্রিত পরিকল্পনা ও বাজেট পদ্ধতি প্রবর্তিত হলে স্থানীয় সরকার স্থানীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারবে।[৪]

উপজেলা সৃষ্টির আগে উন্নয়ন সার্কেলের সংখ্যা ছিল ৪৪২টি। প্রতিটি থানার জন্য বৎসরে ৩ থেকে ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। ১৯৮২-৮৩ অর্থ

বৎসরে ৪৪২টি উন্নয়ন সার্কেলের জন্য পূর্ত কর্মসূচীর আওতাধীন মোট ১৪.৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। উক্ত অর্থ পূর্ত কর্মসূচীর আওতাধীন গ্রামীণ বস্তুগত অবকাঠামোর নির্মাণ ও উন্নয়ন, যেমন রাস্তাঘাট, পুল ও কালভার্ট নির্মাণ, কৃষি ও সেচ সুবিধার জন্য খাল খনন ও পুনঃ খনন, থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র, জোড়াবাড়ী নির্মাণ ও সংস্কার ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। থানাগুলোকে উপজেলায় উন্নীত করার পর উপজেলাগুলোর উন্নয়ন কর্মতৎপরতা বিভিন্ন খাতে বহুগুণ বেড়েছে। প্রতিটি উপজেলা বর্তমানে প্রায় ৩০ হতে ৭০ লক্ষ টাকা জাতীয় সরকারের কাছ থেকে উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী হিসাবে বরাদ্দ পাচ্ছে।[৫] জাতীয় সরকার কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা কমিশন প্রথমে ১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে উপজেলা পরিষদের জন্য নির্দ্দেশনামালা জারি করে এবং ১৯৮৫ সালের জুলাই মাসে সংশোধিত নির্দ্দেশনামালা জারি করা হয়। উক্ত নির্দ্দেশনামালায় উপজেলা পর্যায়ে খাতওয়ারী বিনিয়োগের অনুপাত এবং উন্নয়ন প্রকল্প তৈরী, প্রক্রিয়াকরণ ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

আলোচ্য নিবন্ধে উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়া এবং এ প্রক্রিয়ায় সরকারী নির্দেশাবলী বিশেষ করে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক জারিকৃত নির্দ্দেশ-নামালা যথাযথ অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা বলতে বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচীর অন্তর্গত বিভিন্ন খাতের প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, নির্ধারিত প্রকল্প ছকে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, প্রকল্প বাছাই ও অনুমোদন প্রক্রিয়াকে বুঝানো হয়েছে। এই নিবন্ধে ১৯৮৩-৮৪ হতে ১৯৮৫-৮৬ অর্থ বৎসরের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

নিবন্ধটি ক'টি ভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ, তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, উপজেলা উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা কমিশনের নির্দ্দেশনামালার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ, বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়নের তাত্ত্বিক ও বাস্তব দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থতঃ উক্ত পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার সমস্যাবলী চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। সবশেষে কতিপয় সুপারিশমালা সন্নিবেশিত হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

এই নিবন্ধে প্রাথমিক তথ্য এবং বই ও পত্রিকা, প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বগুড়াস্থ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে ৫-১৭ অক্টোবর, ১৯৮৫ সালে অনুষ্ঠিত উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানদের জন্য প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস ও উন্নয়ন-এর ওপর দু'-সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের ৬২ জন অংশ গ্রহণকারী চেয়ারম্যানের মধ্য থেকে দৈব চয়নের ভিত্তিতে ৪০ জনকে নির্বাচন করা হয়। খোলাখুলি মত বিনিময় এবং প্রশ্নমালার মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া

সমস্যার বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার জন্য গত নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৮৬ ও মার্চ, ১৯৮৭ সালে টাংগাইল জেলার মির্জাপুর, বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ ও মেহেন্দিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল এবং ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলায় শিক্ষা সফর করা হয়। উপরোক্ত উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদের সভায় যোগদান, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প পরিদর্শন, পরিষদের সরকারী ও বেসরকারী সদস্য এবং বিভিন্ন স্তরের জনগণের সাথে মত বিনিময় করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালিত ষষ্ঠ প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কোর্সের ৩৬ জন অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের সাথে সংগৃহীত তথ্যাবলী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং তাদের ফিডব্যাক নেয়া হয়। সর্বোপরি, লেখকের প্রায় দু'বছর উপজেলার চাকুরির অভিজ্ঞতা এ নিবন্ধ রচনায় সাহায্য করেছে। প্রাথমিক তথ্য ছাড়াও বই, প্রতিবেদন ও সাময়িকী থেকে প্রাপ্ত তথ্য এ প্রবন্ধে ব্যবহার করা হয়েছে।

উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনামালা

উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হলো উপজেলা পরিষদ (পরিশিষ্ট ক-এ উপজেলা প্রশাসনের কাঠামো দেয়া হয়েছে)। পরিষদের অন্যতম প্রধান কাজ হলো উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। পরিষদকে স্থানীয় চাহিদা ভিত্তিক পাঁচশালা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করতে বলা হয়েছে। উপজেলায় দু' ধরনের বিষয় রয়েছে ঃ সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত বিষয়। উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা শুধুমাত্র হস্তান্তরিত বিষয়ে কেন্দ্রীভূত থাকবে। জাতীয় সরকার নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উপজেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তর করেছেন ঃ[৬]

(১) কৃষি (সম্প্রসারণ)
(২) গবাদি পশু
(৩) মৎস্য
(৪) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা
(৫) জনস্বাস্থ্য (গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন)
(৬) প্রাথমিক শিক্ষা
(৭) সমবায় (সম্প্রসারণ)
(৮) সমাজ সেবা
(৯) ত্রাণ (কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী)
(১০) পল্লী পূর্ত কর্মসূচী।

১৯৮২ সনের স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস) অধ্যাদেশের ৪০ ধারা মোতাবেক জাতীয় সরকার উপজেলাসমূহ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর সম্যক পরিকল্পনা, নক্সা ও বাস্তবায়নের জন্য ৩১শে জুলাই, ১৯৮৩ সনে একটি উপজেলা নির্দেশনামালা জারী করে যার ভিত্তিতে বিগত

১৯৮৩-৮৪ এবং ১৯৮৪-৮৫ সনে উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়। বিগত দু'বৎসরে উপজেলা পরিষদগুলোর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন, অগ্রগতি ও সমস্যাগুলো পর্যালোচনা করা হয় এবং এর নিরীখে একটি সংশোধিত নির্দেশনামালা গত ১৩ই জুলাই, ১৯৮৫ সনে জারী করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনামালা যথাযথ অনুসরণের জন্য উপজেলা পরিষদগুলোকে বলা হয়েছে। প্রশ্ন করা যেতে পারে কেন এই নির্দেশ-নামালা ? নির্দেশনামালা জারীর পক্ষে যুক্তি নিম্নরূপ ঃ

(১) দেশের ৪৬০টি উপজেলাকে তাদের উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য জাতীয় সরকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী প্রদান করে থাকে যার বিবরণ নীচে দেয়া গেল ঃ

সারণী—১

উপজেলা পরিষদগুলোকে প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী

আর্থিক বৎসর	এডিপি (সংশোধিত)-তে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	এডিপির (সংশোধিত) স্থানীয় মুদ্রায় বরাদ্দের(%)
১৯৮৩-৮৪	১৭০·৯৫	৮·৮৫
১৯৮৪-৮৫	২০০·০০	১০·৩৪
১৯৮৫-৮৬	২০০·০০	১০·৪৬
১৯৮৬-৮৭	১৬০·০০	৮·৮
মোট ঃ	৭৩০.৯৫	

উৎস ঃ উপজেলা সেল, পরিকল্পনা কমিশন।

উপরের সারণীতে ১৯৮৩-৮৪ অর্থ বৎসর থেকে ১৯৮৬-৮৭ পর্যন্ত জাতীয় সরকার কর্তৃক উপজেলা পরিষদগুলোকে প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী সংশোধিত এডিপির স্থানীয় মুদ্রায় বরাদ্দ দেখান হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে সরকার উপজেলা পরিষদগুলোর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করছেন। যেহেতু সরকার অর্থ দিচ্ছেন, সংগত কারণে উক্ত অর্থ যথাযথ ব্যবহারের জন্য সরকার নির্দেশনামালা জারী করেছেন।

(২) জাতীয় পরিকল্পনা, কর্মসূচী ও অগ্রাধিকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উপজেলা পরিষদের উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে উক্ত নির্দেশনা-মালার প্রয়োজন। এর ফলে সমগ্র অর্থনীতিতে সুষম উন্নয়ন সাধিত হবে বলে আশা করা যায়।

(৩) উপজেলা পর্যায়ে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অপেক্ষাকৃত সীমিত থাকাতে উপজেলাগুলোর জন্য আর্থিক বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনার একটি পদ্ধতি নিরূপণের জন্য গঠিত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক মন্ত্রণালয়গুলোর সাথে পরামর্শক্রমে পরিকল্পনা কমিশন উক্ত নির্দেশনামালা প্রদান করে।

(৪) উক্ত নির্দেশনামালা থাকা সত্ত্বেও উৎপাদনমুখী খাতে মোট উন্নয়ন বরাদ্দের মাত্র ২০% ব্যয় করা হয়েছে।[৭] উপজেলা উন্নয়ন তহবিল দিয়ে মিঠাপুকুর উপজেলায় কিণ্ডার গার্ডেন স্কুল ও দোকান নির্মাণ, ক্যামেরা, মাইক্রোফোন ও মোটর সাইকেল কেনা হয়েছে। সিংড়া উপজেলায় জুনিয়র হাই স্কুল নির্মাণ এবং গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ১৪টি টেলিভিশন সেট ক্রয় করা হয়েছে। শেরপুর উপজেলায় টেনিস খেলার মাঠ নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া ইটনা, কেন্দুয়া মধুখালী ও অন্যান্য উপজেলায় মাটির কাজ করা হয়েছে।[৮] উল্লেখ্য, এসব কাজ নির্দেশনামালার পরিপন্থী।

উল্লেখ্য, ৪০ জন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের প্রায় সবাই (৩৮) উক্ত নির্দেশনামালা জারীর পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তবে তারা সবাই খাতওয়ারী অর্থ বরাদ্দের ন্যূনতম ও সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তাদের মতে, এটা স্থানীয় পরিকল্পনার আদর্শের পরিপন্থী। এর ফলে উপজেলাগুলোর আঞ্চলিক তারতম্য, অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করা হয়েছে।[৯]

পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক জুলাই, ১৯৮৩ সালে জারীকৃত উপজেলা পরিষদের জন্য নির্দেশনামালায় উপজেলা পরিষদের উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন নিম্নলিখিত পাঁচটি খাতে কেন্দ্রীভূত থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

(ক) কৃষি ও সেচ এবং শিল্প বিশেষতঃ কুটির শিল্প, (খ) ভৌত (বস্তুগত) অবকাঠামো, (গ) আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো, (ঘ) ক্রীড়া ও সংস্কৃতি এবং (ঙ) বিবিধ তৎপরতা। এই নির্দেশনামালায় বর্ণিত বার্ষিক উপজেলা উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর খাতওয়ারী অর্থ বরাদ্দের অনুসরণযোগ্য পদ্ধতি নিম্নে দেয়া গেল ঃ[১০]

সারণী—২

বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচীর খাতওয়ারী বরাদ্দ পদ্ধতি ঃ

খাত	ন্যূনতম অংশ	সর্বোচ্চ অংশ
কৃষি ও সেচ এবং শিল্প ঃ		
নিবিড় শস্য কর্মসূচী, প্রদর্শনী খামার, বীজ কর্মসূচী, পুকুর খনন, মজা পুকুর সংস্কার, গ্রামীণ মৎস্যখামার, পথিপার্শ্বে বৃক্ষরোপনসহ সামাজিক বন উন্নয়ন ও ফলমূল ও শাক-সব্জীর চাষ, হাঁস মুরগী ও গবাদি পশুর উন্নয়ন, জল নিস্কাশন ও সেচ ব্যবস্থা, ছোট ছোট বন্যা নিরোধক বাঁধ, কুটির শিল্প ওয়ার্কশপ কর্মসূচী, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ, আয় সৃষ্টিকারী কর্মতৎপরতাসমূহ প্রভৃতি।	৩০%	৪০%

(ক্রমাগত)

বস্তুগত অবকাঠামো ঃ		
পরিবহণ ও যোগাযোগ, পল্লীপূর্ত কর্মসূচী, গ্রামীণ রাস্তাঘাট, ছোট ছোট সেতু, কালভাট ইত্যাদির উন্নয়ন (গৃহ নির্মাণ ও বস্তুগত পরিকল্পনা) হাট ও বাজার, গুদামজাতকরণের সুযোগ সুবিধা, কম্যুনিটি সেন্টার, পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যগত পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতির উন্নয়ন ইত্যাদি।	২৫%	৩৫%
আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো ঃ		
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ভবন, খেলার মাঠ, শিক্ষা উপকরণের উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যগত পরিচ্ছন্নতা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, সমাজ কল্যাণ তৎপরতা প্রভৃতি।	১৭·৫%	২৭·৫%
ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ঃ		
খেলাধূলা, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক তৎপরতা প্রভৃতির উন্নয়ন	৫%	১০ %
বিবিধ কার্যাবলী ঃ		
জন্ম ও মৃত্যু রেজিষ্ট্রিকরণ সংক্রান্ত কার্য, দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণকার্য (প্রয়োজনবোধে) প্রভৃতি।	২·৫%	৭·৫%

পরবর্তীকালে অর্থাৎ জুলাই, ১৯৮৫ সালে পরিকল্পনা কমিশন উপজেলা পরিষদের জন্য সংশোধিত নির্দেশনামালা প্রকাশ করে। এই নির্দ্দেশনামালায় নিম্নলিখিত নয়টি খাত দেখানো হয়েছে ঃ

(ক) কৃষি ও সেচ
(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প
(গ) পরিবহন ও যোগাযোগ
(ঘ) গৃহ নির্মাণ ও বস্তুগত পরিকল্পনা
(ঙ) শিক্ষার উন্নয়ন
(চ) স্বাস্থ্য ও সমাজ সেবা
(ছ) ক্রীড়া ও সংস্কৃতি
(জ) ইউনিয়ন পর্যায়ে পূর্ত কর্মসূচী এবং
(ঝ) বিবিধ কার্যাবলী।

বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচী (এ,ইউ,ডি,পি)-এর অন্তর্গত বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কার্যাবলীর একটি খাতওয়ারী অর্থ বরাদ্দের অনুসরণীয় পদ্ধতি অপর পৃষ্ঠায় দেয়া গেল ঃ[১১]

সারণী—৩

বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচীর খাতওয়ারী বরাদ্দ পদ্ধতি ঃ

	খাত	উন্নয়ন জমার ন্যূনতম অংশ	উন্নয়ন জমার সর্বোচ্চ অংশ
(ক)	**কৃষি ও সেচ ঃ** নিবিড় শস্য কর্মসূচী, প্রদর্শনী খামার, বীজ কর্মসূচী, পুকুর খনন, মজা পুকুর সংস্কার, গ্রামীণ মৎস্য খামার, পথিপার্শ্বে বৃক্ষ রোপণসহ সামাজিক বন উন্নয়ন এবং ফলমূল ও শাক সব্জীর চাষ, হাঁস মুরগীর ও গবাদি পশুর উন্নয়ন, জল নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থা, ছোট ছোট বন্যা নিরোধক বাঁধ এবং ক্ষুদ্র সেচ কাঠামো।	১৫%	২৫%
(খ)	**ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ঃ** ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ওয়ার্কশপ কর্মসূচী, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ, আয় সৃষ্টিকারী কর্মতৎপরতা ইত্যাদি।	৫%	১০%
	বস্তুগত অবকাঠামো ঃ		
(গ)	**পরিবহন ও যোগাযোগ ঃ** রাস্তা নির্মাণ, পল্লী পূর্ত কর্মসূচী, ছোট ছোট সেতু, কালভার্ট ইত্যাদির নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ ও উন্নয়ন।	১৭·৫%	৩০%
(ঘ)	**গৃহ নির্মাণ ও বস্তুগত পরিকল্পনা ঃ** হাট ও বাজার, গুদামজাত করণের সুযোগ সুবিধা, কম্যুনিটি সেন্টার, পল্লী পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা, স্বল্প ব্যয়ে পায়খানা নির্মাণ প্রভৃতি।	১০%	১৭·৫%
	আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো ঃ		
(ঙ)	**শিক্ষার উন্নয়ন ঃ** শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ভবন, খেলার মাঠ, শিক্ষা উপকরণের উন্নয়ন।	৫%	১২·৫%
(চ)	**স্বাস্থ্য ও সমাজ সেবা ঃ** স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যগত পরিচ্ছন্নতা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, শিশু, যুবক ও মহিলা কল্যাণসহ সমাজ সেবা কার্যাবলী।	৭·৫%	১৫%

(ক্রমাগত)

(ছ)	**ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ঃ** খেলাধুলা, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক তৎপরতা প্রভৃতির উন্নয়ন।	২·৫%	৭·৫%
(জ)	ইউনিয়ন পর্যায়ে পল্লীপূর্তকর্মসূচী বাস্তবায়ন-এর জন্য পরিষদ সমূহকে অনুদান।	৫%	৭·৫%
(ঝ)	**বিবিধ কার্যাবলী ঃ** জন্ম ও মৃত্যু রেজিস্ট্রিকরণ সংক্রান্ত কার্য, দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণকার্য (প্রয়োজনবোধে উপজেলা জরীপ ও উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর তদারকী ব্যয় হিসাবে ০·৫% অর্থ এই খাত থেকে ব্যবহার করা যাবে)।	২·৫%	৫%

সারণী—৪

বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচীর খাতওয়ারী বরাদ্দ পদ্ধতি ঃ
১৯৮৩ ও ১৯৮৫ সনে জারীকৃত নির্দেশনামালার তুলনা

খাত	১৯৮৩ সনের নির্দ্দেশনামালা		১৯৮৫ সনের নির্দ্দেশনামালা	
	ন্যূনতম অংশ	সর্বোচ্চ অংশ	ন্যূনতম অংশ	সর্বোচ্চ অংশ
১। কৃষি ও সেচ এবং শিল্প	৩০%	৪০%	২০%	৩৫%
(ক) কৃষি ও সেচ	—	—	১৫%	২৫%
(খ) শিল্প	—	—	৫%	১০%
২। বস্তুগত অবকাঠামো	২৫%	৩৫%	২৭·৫%	৪৭·৫%
(ক) পরিবহন ও যোগাযোগ	—	—	১৭·৫%	৩০%
(খ) গৃহ নির্মাণ ও বস্তুগত পরিকল্পনা	—	—	১০%	১৭·৫%
৩। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো	১৭·৫%	২৭·৫%	১২·৫%	২৭·৫ %
(ক) শিক্ষার উন্নয়ন	—	—	৫%	১২·৫%
(খ) স্বাস্থ্য ও সমাজ সেবা	—	—	৭·৫%	১৫%
৪। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৫%	১০%	২·৫%	৭·৫%
৫। ইউনিয়ন পর্যায়ে পূর্ত কর্মসূচী	—	—	৫%	৭·৫%
৬। বিবিধ কার্যাবলী	২·৫%	৭·৫%	২·৫%	৫%

কৃষি ও সেচ এবং শিল্প খাতে বরাদ্দ ১৯৮৩ সনের তুলনায় ১৯৮৫ সনের নির্দ্দেশনায় কমে গেছে ঃ ১৯৮৩ সনে এ খাতে ন্যূনতম বরাদ্দ ছিল ৩০% ও সর্বোচ্চ অংশ ৪০%; ১৯৮৫ সনে তা কমে যথাক্রমে হয়েছে ২০% ও ৩৫%।

অপরদিকে বস্তুগত অবকাঠামো খাতে ১৯৮৩ সনের ন্যূনতম ২৫% ও সর্বোচ্চ বরাদ্দ ৩৫% থেকে ১৯৮৩ সনে বেড়ে যথাক্রমে ২৭.৫% ও ৪৭.৫% হয়েছে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে ১৯৮৩ সনের নির্দেশনামালার তুলনায় ১৯৮৫ সনের নির্দেশনামালায় প্রত্যক্ষ উৎপাদনমূলক খাতে যেমন—কৃষি, ও বন, মৎস্য ও পশুপালন, হাঁসমুরগী পালন এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অপর দিকে বস্তুগত অবকাঠামো খাতে আগের তুলনায় বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন ঃ তাত্ত্বিক দিক

উপজেলা প্রশাসন ম্যানুয়েল-এর প্রথম খণ্ডে উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা অর্থ ও পরিকল্পনা অফিসার (বর্তমানে উপজেলা অর্থ অফিসার) ও উপজেলা প্রকৌশলীর সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে যে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ইউ,এন,ও তাঁদের নিজ নিজ কাজে এত বেশী ব্যস্ত থাকেন যে পরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যাপারে তারা যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না। গবেষণাকালীন সময়ে উল্লেখিত উপজেলাগুলোতে উপজেলা অর্থ অফিসারের পদটি শূন্য ছিল। উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে উপজেলা অর্থ অফিসারের দায়িত্ব পালন করছিলেন। উল্লেখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সামগ্রিক দায়িত্ব উপজেলা প্রকৌশলীর ওপর বর্তায়। আই, এম, ই, ডি-এর মূল্যায়ন প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে প্রকল্প প্রণয়ন অধিকাংশ উপজেলাতেই উপজেলা প্রকৌশলী করে থাকেন। কোন কোন উপজেলাতে ইউ, এন, ও, ও উপজেলা অর্থ অফিসার প্রকল্প প্রণয়ন করেন।[১২] উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণকালে উপজেলা পরিষদগুলোকে নিম্নলিখিত বিষয় অবগত থাকতে হবে ঃ[১৩]

(ক) চলতি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রতিফলিত জাতীয় সরকারের লক্ষ্য ও অগ্রাধিকারগুলো।

(খ) উপজেলা পরিষদগুলো কেবলমাত্র সেইসব প্রকল্পই গ্রহণ করবে যার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত সম্পদের দ্বারা সম্পন্ন করা সম্ভব এবং যে সকল প্রকল্প জাতীয় কর্মসূচীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

নিম্নে বার্ষিক উপজেলা কর্মসূচী (এ,ইউ,ডি,পি) প্রণয়ন প্রক্রিয়া দেয়া গেল ঃ

১। প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ঃ উপজেলা পরিষদ যে সকল প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে তা অবশ্যই উপজেলা পরিকল্পনার সার্বিক কাঠামো (উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচী)-এর অন্তর্গত হতে হবে এবং উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দের ব্যাপারেও নির্দেশনামালা অনুসরণ করতে হবে।

একক প্রকল্পগুলোর জন্য নিম্নলিখিত আর্থিক সীমাসমূহ মেনে চলতে হবে ঃ[১৪]

(ক) নির্মাণ প্রকল্পসমূহের জন্য ২০ লক্ষ টাকা

(খ) অন্যান্য প্রকল্পের জন্য ১০ লক্ষ টাকা

অবশ্য এই সীমা সারণী—৩ এ প্রদর্শিত শতাংশওয়ারী, খাতওয়ারী বরাদ্দেরও শর্তাধীন থাকবে।

প্রকল্প চিহ্নিতকরণের স্তরে প্রকল্প নির্বাচন কমিটির সদস্যরা প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে যাবেন এবং উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আহবান করে তাদের উপস্থিতিতে প্রকল্প চিহ্নিতকরণের কাজ সম্পন্ন করবেন।

২। **প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন** ঃ প্রকল্প চিহ্নিত করণের পর প্রকল্প প্রস্তাবগুলো নির্ধারিত ছক (পরিশিষ্ট খ) অনুসারে উপজেলা পরিষদের নির্দ্দেশনানুযায়ী সংশ্লিষ্ট উপজেলা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রণীত হবে। তিনিই উক্ত প্রকল্পসমূহ পরিষদের বিধিমালা অনুযায়ী উপজেলা পরিষদে অথবা ক্ষেত্র বিশেষে প্রকল্প নির্বাচন কমিটির বিবেচনাকল্পে পেশ করার জন্য দায়ী থাকবেন।

৩। **প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা** ঃ উন্নয়ন প্রকল্পের যথার্থ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং কারিগরী বিশ্লেষণের কাজ সম্পাদন করার জন্য উপজেলা পরিষদ প্রয়োজনবোধে পরিষদের সদস্যদের সমন্বয়ে কিংবা সদস্য নন এমন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে উপ-কমিটি গঠন করতে পারে। নির্দ্দেশনায় বলা হয়েছে যে সম্ভাব্যতা যাচাই না করে কোন প্রকল্প নেয়া যাবেনা।

৪। **প্রকল্প নির্বাচন** ঃ প্রকল্প চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রত্যেক উপজেলা পরিষদে একটি "প্রকল্প নির্বাচন কমিটি" থাকবে। নির্বাচিত সদস্য ও সরকারী কর্মকর্তাসহ এই কমিটির সদস্য সংখ্যা ৭ জনের বেশী হবে না। উক্ত কমিটির সদস্যরা প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে গিয়ে উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আহবান করে তাঁদের উপস্থিতিতে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো পরীক্ষা ও নির্বাচন (বাছাই) করবেন। প্রকল্প নির্বাচনের ব্যাপারে পরিষদ নিম্নোক্ত শর্তাবলী পালন করবে ঃ[১৫]

(ক) কেবলমাত্র সেই সকল প্রকল্পই গ্রহণ করতে হবে যা দু'বৎসরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

(খ) কোন একটি প্রকল্পের ব্যয় বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচীর অন্তর্গত কোন একটি বিশেষ খাতের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের এক তৃতীয়াংশের বেশী হবে না।

(গ) উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণকালে উপজেলা পরিষদ স্বকর্ম সংস্থাপন ও উপার্জন বৃদ্ধি মূলক তৎপরতাসহ কর্ম সংস্থাপনের সুযোগ সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব প্রদান করবে।

৫। **প্রকল্প অনুমোদন** ঃ উপজেলা পরিষদগুলো তাদের উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর জন্য অনুমোদন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষরূপে কাজ করবে। প্রত্যেকটি প্রকল্প অনুমোদনের সিদ্ধান্ত উপজেলা পরিষদের বৈঠকের মতৈক্যের ভিত্তিতে গৃহীত হবে। মতৈক্যের অভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তই ভোটের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে।

উপজেলা পরিষদের বৈঠকে উপস্থিত অফিসারগণ আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণ ও কারিগরি পরামর্শ প্রদান করতে পারেন কিন্তু ভোট দিতে পারবেন না।

বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন ঃ বাস্তব দিক

১। **প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ঃ** অনুসন্ধ্যান করে দেখা গেছে যে ১২৩টি উপজেলার সবগুলো বা অধিকাংশ উপজেলায় এখনো প্রকল্প নির্বাচন কমিটি গঠিত হয় নি। যেখানে এরূপ কমিটি গঠিত হয়েছে সেখানে উক্ত কমিটির সদস্যরা প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে যান না।[১৬] বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভাগের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে নির্বাচিত ৬৪টি উপজেলার মধ্যে যে ৩০টি উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে বলে দাবী করেছে তারা কেবলমাত্র পাঁচ বৎসর মেয়াদী একটি তালিকা প্রস্তুত করেছে। অবশিষ্ট উপজেলা পরিষদ পাঁচ বৎসরের জন্য প্রকল্প তালিকাও প্রস্তুত করেনি। অধিকাংশ উপজেলা পরিষদই বার্ষিক কর্মসূচী প্রণয়ন করেনি।[১৭] এর ফলে প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, নির্বাচন এডহক ভিত্তিতে হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গৃহীত হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ নিজেরাই প্রকল্প চিহ্নিত করেন। উদাহরণস্বরূপ, মির্জাপুর উপজেলায় একজন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে উপজেলা পরিষদের প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, নির্বাচন ও অনুমোদনে কর্তৃত্ব করতে দেখা গেছে।

২। **প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ঃ** তাত্ত্বিকভাবে প্রকল্প প্রস্তাব নির্ধারিত ছক অনুসারে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রণীত হবার কথা। কিন্তু আই এম ইডি প্রতিবেদনে দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারিত ছকে পরিকল্পনা প্রণীত হয় না। এর অন্যতম কারণ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অপর্যাপ্ততা। নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলায় নিযুক্ত কর্মকর্তাগণ স্ব স্ব ক্ষেত্রে সঠিকভাবে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন তথা পিপি তৈরী করতে ব্যর্থ হয়েছেন।[১৮] এমনও দেখা গেছে যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে না জানিয়ে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বৎসরে ধামরাই উপজেলার মৎস্য বিভাগের ৭টি প্রকল্পের কথা উল্লেখ করা যায়। উক্ত প্রকল্পগুলোর প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন স্তরে উপজেলা মৎস্য অফিসারের অংশগ্রহণ ছিল না। পরবর্তী সময়ে দুটো প্রকল্পের কাজের চূড়ান্ত অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁর মতামতের জন্য নথি পাঠানো হলে তিনি এই বলে নথিটি ফেরত দেন যে এ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। এরপর উক্ত কর্মকর্তা এ বিষয়ে আর কিছু অবহিত নন।

৩। **প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ঃ** সম্ভাব্যতা, উপযোগিতা ও চাহিদা যাচাই না করে মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।[১৯] যেহেতু প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, নির্বাচন ও প্রণয়ন এডহক ভিত্তিতে হয় সেহেতু সম্ভাবতা সমীক্ষা করার প্রশ্নই উঠে না। উল্লেখিত উপজেলাগুলোতে এ ধরণের কোন সমীক্ষা হয়েছে বলে লেখকের চোখে পড়েনি।

৪। **প্রকল্প নির্বাচন ঃ** কতিপয় উপজেলা পরিষদ জানায় যে পরিষদের বৈঠকেই প্রকল্প বাছাই করে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান এবং বার্ষিক অর্থ বরাদ্দ করা হয়। প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিছু শর্তাবলী অনুসরণ করা হয়। যেমন,---উক্ত উপজেলাগুলোতে দুই বৎসরের অধিক মেয়াদী প্রকল্প নির্বাচন করা হয়নি। কিন্তু অন্য শর্তগুলো লংঘন করা হয়েছে যেমন ঃ[২০]

(ক) কয়েকটি উপজেলা পরিষদ (যেমন সিংড়া, নাচোল, চন্দনাইশ, পাঁচবিবি, শাহজাদপুর কতিপয় প্রকল্পে নিদিষ্ট খাতের জন্য বরাদ্দকৃত মোট অর্থের এক তৃতীয়াংশের অধিক বরাদ্দ করেছে।

(খ) বস্তুগত অবকাঠামো, পরিবহন ও যোগাযোগ প্রকল্প প্রাধান্য পেয়েছে। অথচ প্রত্যক্ষ উৎপাদনমূলক খাতগুলো যেমন কৃষি ও বন, মৎস্য ও পশুপালন, হাঁস-মুরগী পালন এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে কম গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ৬৪টি উপজেলা পরিষদের খাতওয়ারী বরাদ্দ ও ব্যয় থেকে তা স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে ঃ

সারণী—৫

খাতওয়ারী বরাদ্দ ও ব্যয়

(১৯৮৩-৮৪ ও ১৯৮৪-৮৫) (লক্ষ টাকায়)

খাত	পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশমালা অনুযায়ী বরাদ্দের হার।	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক বরাদ্দ (বার্ষিক প্রাপ্ত অর্থের %)		উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ব্যয়িত অর্থের পরিমান (বরাদ্দের %)	
		১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫
১	২	৩	৪	৫	৬
১। কৃষি, সেচ ও শিল্প	৩০-৪০%	৭৪৬·১০ (২৮%)	৮৩১·৭৫ (২৬%)	৬৫২·১০ (৮৭%)	৬৬৯·৩৭ (৮০%)
২। বস্তুগত অব-কাঠামো	২৫-৩৫%	৬৯২·১৭ (২৬%)	১১১৬·৮৩ (৩৫%)	৭৬৮·২৩ (১১১%)	৯৯০·৫৪ (৮৯%)
৩। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো	১৭·৫-২৭·৫%	৬২৪·৩০ (২৩%)	৭৯০·৬৫ (২৫%)	৫৫৭·৫৯ (৮৯%)	৬৬৬·৭৯ (৮৪%)
৪। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৫-১০%	১৪৬·২৪ (৫%)	১৬৮·৯৫ (৫%)	১২৭·৯৫ (৮৭%)	১৩২·৯৫ (৭৯%)
৫। বিবিধ কার্যাবলী	২·৫-৭·৫%	৭৭·২১ (৩%)	২৩৪·৬৮ (৭%)	৭১·৬৬ (৯৩%)	১৩৪·০৭ (৫৭%)
মোট ঃ		২২৮৬·০২	৩১৪২·৮৬	২১৭৭·৫৩ (৯৫%)	২৫৯৩·৭২ (৮৩%)

সূত্র ঃ বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভাগ ঃ উপজেলা কার্যক্রম মূল্যায়ন প্রতিবেদন (১৯৮৬)

সারণী—৫ হতে দেখা যায় যে ১৯৮৩-৮৪ ও ১৯৮৪-৮৫ সালে কৃষি, সেচ ও শিল্প খাতে সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী ৩০-৪০%-এর স্থলে যথাক্রমে ২৮% ও ২৬% বরাদ্দ করা হয়েছে। অন্যান্য খাতে বরাদ্দ মোটামুটি নীতিমালা অনুসারে হয়েছে।

১৯৮৫-৮৬ সালের খাতওয়ারী বরাদ্দ ও ব্যয় সারণী ৬-এ দেখানো হলো ঃ

সারণী—৬

১৯৮৫-৮৬ সালের খাতওয়ারী বরাদ্দ ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

খাত	পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশমালা অনুযায়ী বরাদ্দের হার।	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক বরাদ্দ (প্রাপ্ত অর্থের %)	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ (বরাদ্দের %)
১	২	৩	৪
১। কৃষি ও সেচ	১৫-২০%	৫৩৮·২৩ (১৭%)	৩১৯·৮৬ (৫৯%)
২। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	৫-১০%	৯৩·০৮ (৩%)	৪২·৩৩ (৪৫%)
৩। পরিবহণ ও যোগাযোগ	১৭·৫-৩০%	৯১৯·৫৫ (২৮%)	৭৯০·০৪ (৮৬%)
৪। গৃহ নির্মাণ ও বস্তুগত পরিকল্পনা	১০-১৭.৫%	৩৭৪·৯৯ (১২%)	২০৭·০৯ (৫৫%)
৫। শিক্ষার উন্নয়ন	৫-১২·৫%	৪৪৮·৯৬ (১৪%)	২৫৯·৩৭ (৫৮%)
৬। স্বাস্থ্য ও সমাজসেবা	৭·৫-১৫%	১৭৮·৭৪ (৬%)	৮০·৬৫ (৪৫%)
৭। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	২·৫-৭·৫%	৭১·১৩ (২%)	৫৯.৭৮ (৮৫%)
৮। পল্লী পূর্তকর্মসূচীর জন্য ইউনিয়ন পরিষদ সমূহকে অনুদান	৫-৭·৫%	১৯২·৭০ (৬%)	১৩৭·৩৬ (৭১%)
৯। বিবিধ কার্যাবলী	২·৫-৫%	১৪০·৬৪ (৪%)	৮২·৩০ (৫৯%)
মোট		২৯৫৮·০২ (৯১%)	১৯৭৮·৭৫ (৬৭%)

সূত্র ঃ আই এম ইডি প্রতিবেদন (১৯৮৬)

সারণী ৬-এ লক্ষ্য করা যায় যে ১৯৮৫-৮৬ সালে উপজেলা পরিষদ সমূহ কর্তৃক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, স্বাস্থ্য ও সমাজসেবা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি খাতে ন্যূনতম হারের নীচে অর্থ বরাদ্দ করেছে। পক্ষান্তরে শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্পে অধিক বরাদ্দ করেছে।

৫। **প্রকল্প অনুমোদন ঃ** তাত্ত্বিকভাবে উপজেলা পরিষদের বৈঠকে মতৈক্যের ভিত্তিতে গৃহীত হয়। কার্যতঃ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও

প্রতিনিধি সদস্যরাই প্রকল্প অনুমোদন করে থাকেন। উল্লেখিত উপজেলাগুলোতে সরকারী সদস্যদেরকে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। মির্জাপুর উপজেলা পরিষদের সভায় লক্ষ্য করা গেছে যে সরকারী ও প্রতিনিধি সদস্যরা একে অন্যের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখেন। অনেক ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের প্রতিনিধি সদস্য ও সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে বিরাজমান তিক্ত সম্পর্ক ও সহযোগিতার অভাবে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনেকাংশে ব্যাহত হয়েছে।

সমস্যাবলী

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়নের তাত্ত্বিক ও বাস্তব দিকের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে এ পার্থক্যের কারণ কি? প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কারণগুলোর জন্য উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে ঃ

(১) উপজেলা পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় গরীব জনসাধারণের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের অভাব

বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন পদ্ধতির পেছনে যে অনুমান কাজ করে তাহলো স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র নির্বাচিত পরিষদেরই ভূমিকা থাকবে না, বরং উপকারভোগীদেরও অংশগ্রহণ থাকবে। উন্নয়ন প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও নির্বাচনের স্তরে "প্রকল্প নির্বাচন কমিটির" সদস্যদের প্রতিটি ইউনিয়নে গিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করার কথা নির্দেশমালায় বর্ণিত আছে। আমরা যদি ধরে নেই যে উক্ত কমিটির সদস্যরা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগী নিয়ে প্রকল্প চিহ্নিত ও নির্বাচনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদে যান, তাহলেই কি স্থানীয় চাহিদা ভিত্তিক প্রকল্প চিহ্নিত ও নির্বাচিত হবে? নিশ্চয়ই না। কারণ যাদের সাথে তারা আলাপ আলোচনা করবেন তাদের স্বার্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গরীব মানুষের (ক্ষুদ্র কৃষক, ভূমিহীন ইত্যাদি) স্বার্থের অনুকূলে নয়। এটা তাদের শ্রেণী চরিত্র বিশ্লেষণ করলেই স্পষ্ট হবে। ১৯৭৮ সালে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের ওপর চালিত একটি জরীপে দেখা গেছে যে তাদের ৬০% ভাগ মাথাপিছু ৭·৫ একরের বেশী জমির মালিক এমন এক দেশে যেখানে ৭০% বেশী কৃষক-এর মাথাপিছু ২·৫ একরের কম জমি রয়েছে। অনুসন্ধানে আরো দেখা গেছে যে তাদের প্রায় অর্ধেক সরকারী অফিসে আসার পর অতিরিক্ত জমি অর্জন করেছেন।[১১] অনুরূপভাবে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের স্বার্থও অধিকাংশ ক্ষেত্রে খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থের অনুকূলে নয়। শুধু কি তাই? উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানদের শ্রেণী চরিত্র সম্পর্কে সারণী ৭ থেকে ধারণা পাওয়া যাবে।

সারণী—৭

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানদের জমির মালিকানার প্রকৃতি

জমির মালিকানা (একর)	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের সংখ্যা	শতকরা হার
ভূমিহীন	—	—
০·৫—২·৪৯ (ক্ষুদ্র কৃষক)	—	—
২·৫—৭·৪৯ (মাঝারী কৃষক)	৮	২০
৭·৫—তদুর্দ্ধে (ধনী কৃষক)	৩২	৮০
মোট	৪০	১০০

উৎস ঃ লেখক কর্তৃক ৪০ জন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ।

সারণী ৭ থেকে দেখা যায় যে ৮০% চেয়ারম্যান হলেন ধনী কৃষক, অন্যদিকে মাত্র ২০% জন মাঝারী কৃষক। সংগত কারণেই বলা যায় যে তাদের স্বার্থ গরীব মানুষের স্বার্থের অনুকূলে নয়। উল্লেখিত উপজেলাগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে প্রকল্প প্রণয়নের বিভিন্ন স্তরে গরীব জনগণের অংশ গ্রহণ নেই বললেই চলে। প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়া 'এলিটিস্ট' বলা যায়। এই বক্তব্যের সমর্থন নিলে উক্ত চেয়ারম্যানদের নিম্নলিখিত মতামত থেকে।

সারণী—৮

উপজেলা পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় গরীব জনগণের অংশগ্রহণের মান।

অংশগ্রহণের মান	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানদের সংখ্যা	শতকরা হার
অত্যন্ত সন্তোষজনক	৬	১৫
সন্তোষজনক	১২	৩০
সন্তোষজনক নয়	২২	৫৫
মোট	৪০	১০০

উৎস ঃ লেখক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ।

৪০ জন চেয়ারম্যানের মধ্যে ২২ জন (৫৫%) এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, উপজেলা পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় গরীব জনগণের অংশগ্রহণ সন্তোষজনক নয়। অংশগ্রহণ বলতে তারা প্রকল্প প্রণয়নের বিভিন্ন স্তরে ভূমিকার কথা বলেছেন। পাঁচটি উপজেলার সরকারী সদস্যরাও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। তারা অনেক ক্ষেত্রেই প্রকল্পের সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

(২) উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার পদ্ধতিগত ত্রুটি

উন্নয়ন পরিকল্পনার দুটো অত্যাবশ্যক দিক হলো খাতওয়ারী ও এলাকা ভিত্তিক (Spatial) পদ্ধতি।[১১] খাতওয়ারী পরিকল্পনা পদ্ধতির উদ্দেশ্য হলো অর্থনীতির বিভিন্ন খাত যথা---কৃষি, শিল্প, পরিবহন ও যোগাযোগ, শক্তি ইত্যাদি খাতের এককভাবে বা একই সঙ্গে উন্নতি বিধান। এই পদ্ধতির অন্যতম দুর্বলতা হলো এটা এলাকার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য তারতম্য, সম্ভাবনা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে উপেক্ষা করেছে। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বলতে হয় এই পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের কথা উল্লেখ করা হলেও কিভাবে প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি করা যায় সে সম্পর্কে অবহেলা করা হয়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনার আর একটি গুরুত্ব উদ্দেশ্য যথা---সম্পদের অধিকতর সুষম বন্টনকে উপেক্ষা করা হয়েছে। অপরদিকে এলাকাভিত্তিক পদ্ধতি হলো মূলতঃ আঞ্চলিক পরিকল্পনা পদ্ধতি। এর তিনটি দিক হচ্ছেঃ (১) অর্থনৈতিক; (২) সামাজিক ও (৩) পরিবেশগত। উক্ত পদ্ধতিতে পরিকল্পনার অঞ্চলগুলোকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা হয়েছেঃ

(১) অর্থনৈতিক অঞ্চলঃ (ক) গতিশীল অঞ্চল; (খ) সম্ভাবনাময় অঞ্চল ও (গ) সমস্যা জর্জরিত অঞ্চল।

(২) সামাজিক অঞ্চলঃ (ক) সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে অনুন্নত অঞ্চল (খ) অর্থনৈতিকভাবে গরীব অঞ্চল যেখানে মাথাপিছু আয় খুব কম; ও (গ) গ্রামীণ ও শহুরে অঞ্চল।

(৩) পরিবেশগত অঞ্চলঃ (ক) পরিবেশগতভাবে ধ্বংশপ্রাপ্ত অঞ্চল (খ) যে অঞ্চলে পরিবেশ সংরক্ষণ প্রয়োজন ও (গ) যে অঞ্চলে বিশেষ পরিবেশগত সমস্যায় জর্জরিত।

অতএব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার অব্যাহত ভাবে বৃদ্ধি ও উন্নয়নের সুফল সুষম বন্টনের লক্ষ্য অর্জন করতে হলে পরিকল্পনায় একই সঙ্গে খাতওয়ারী, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত দিক থাকতে হবে। আর এ জন্য প্রয়োজন খাতওয়ারী ও এলাকাভিত্তিক পরিকল্পনা পদ্ধতির একত্রীকরণ।

বাংলাদেশের পরিকল্পনা পদ্ধতি লতঃ খাতওয়ারী ভিত্তিক। পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনামালায় খাতওয়ারী ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু এলাকা ভিত্তিক পদ্ধতিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। শুধু উপেক্ষা করা হয়নি, বরং খাতওয়ারী অর্থ বরাদ্দের ন্যূনতম ও সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের ফলে এলাকা ভিত্তিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে উপজেলাগুলোর আঞ্চলিক তারতম্য, বৈশিষ্ট্য, অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপেক্ষিত হয়েছে।

(৩) উপজেলা পর্যায়ে অনুন্নত ও বিচ্ছিন্ন তথ্য ব্যবস্থা

যথোপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন নির্ভর করে নির্ভরযোগ্য ও উন্নতমানের পরিসংখ্যানের ওপর। উন্নয়ন প্রকল্প সঠিকভাবে চিহ্নিতকরণ, অগ্রাধিকার নিরূপণ, নির্বাচন ইত্যাদির জন্য উপজেলা পর্যায়ে উন্নত তথ্য ব্যবস্থা প্রবর্তন করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এখনো উপজেলা পর্যায়ে তথ্য ব্যবস্থা অনুন্নত ও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। এর প্রধান কারণ হলো পল্লী উন্নয়নের জন্য সুসংহত জাতীয় কলাকৌশলের অভাব। বাংলাদেশের অধিকাংশ পরিসংখ্যান ঐতিহাসিকভাবে প্রশাসনের উপজাত হিসেবে সংগৃহীত হয়েছে।[৩] তথ্য সংগ্রহ বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কদাচিৎ জনসাধারণের অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়।

সারণী-৯এ উপজেলা পর্যায়ে অনুন্নত তথ্য ব্যবস্থার চিত্র ফুটে ওঠেছে।

সারণী—৯

উপজেলা পর্যায়ে অনুন্নত তথ্য ব্যবস্থা

জরীপ হয়েছে	উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১২	৩০
না	২৮	৭০
মোট	৪০	১০০

উৎস ঃ লেখক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ।

সারণী ৯ থেকে প্রতীয়মান হয় যে ৭০% উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বলেছেন যে তাদের উপজেলায় কোন জরীপ করা হয়নি। এর ফলে পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

উল্লেখিত ৫টি উপজেলা সফরের সময় পরিষদ সদস্যদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে তারা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (ডিসেম্বর, ১৯৮৫ প্রকাশিত)-এ উপজেলা সম্পর্কিত বিষয়গুলো সম্বন্ধে (পরিশিষ্ট-গ) অবহিত আছেন কিনা। তারা সবাই 'না' সূচক উত্তর দিয়েছেন। এতে যোগাযোগের ফাঁক লক্ষ্য করা যায়।

(৪) উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অভাব

এখনো উপজেলা পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে যে দক্ষতার প্রয়োজন তা নেই বললেই চলে। এর প্রধান কারণ হলো যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অভাব। এটা বার বার লক্ষ্য

করা গেছে যে বিভাজিত ক্ষমতা যদি প্রশাসনিক বা আর্থিক যোগ্যতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তাহলে অদক্ষতা অনিবার্য।[২৪] এই মূল কারণ হলো উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যাপক ও প্রয়োজনভিত্তিক প্রশিক্ষণের অভাব। উদাহরণস্বরূপ তৎকালীন ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস (আই এম এস)-এর সদস্যদের বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারভুক্ত করে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে উপজেলায় পোষ্টিং দেয়া। তাদের তাত্ত্বিক ও বাস্তব জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে উপজেলা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড দারুণভাবে ব্যহত হয়েছে। মাত্র ১ বৎসরের সামান্য বেশী সময়ের মধ্যে (৭ই নভেম্বর, ১৯৮২—১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪) দশটি পর্যায়ে ৪৬০টি থানাকে উপজেলায় উন্নীত করার ফলে মূলতঃ উক্ত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

সুপারিশমালা

(১) উপজেলা পরিষদকে কার্যকরী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাঃ

এ সম্পর্কে বিকল্প সুপারিশমালা নীচে দেয়া হলো ঃ

(ক) উপজেলা পরিষদে গ্রামীণ গরীবদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা

উপজেলা পরিষদে পল্লীর দরিদ্র শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের অভাবে পরিষদ কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারছে না। তাই পরিষদকে সত্যিকার অর্থে জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য কোন কোন লেখক আমূল ভূমি সংস্কারের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[২৫] কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এ ধরনের ভূমি সংস্কার বা অন্য কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। তাই বর্তমান সমাজ কাঠামোর মধ্যে গ্রামীণ গরীবদের পরিষদে বাধ্যতামূলক প্রতিনিধিত্ব থাকা প্রয়োজন। জাতীয় সরকার স্থানীয় ভূমিহীন সমবায় সমিতি বা গ্রামীণ ব্যংকের সদস্য বা ক্ষুদ্র চাষী সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান থেকে কমপক্ষে দু'জন প্রতিনিধি প্রত্যেক উপজেলা পরিষদের সদস্য পদে মনোনয়ন দান করতে পারেন।

এ প্রস্তাবের সুবিধে ও অসুবিধে উভয়ই আছে। সুবিধে হলো এই যে গ্রামীণ গরীবদের পরিষদে স্থান হবে তাদের বক্তব্য পেশ করার জন্য। এর ফলে তাদের সমস্যা সমাধানে পরিষদ কার্যকরী ভূমিকা পালনে সচেষ্ট হবে। কিন্তু স্থানীয় গরীব সদস্যদের মনোনয়ন দানের ক্ষেত্রে প্রায়োগিক সমস্যা রয়েছে। সত্যিকার গরীব প্রতিনিধি নির্বাচন দুরূহ ব্যাপার।

(খ) উপজেলা পরিষদের সরকারী সদস্যদের ভোটাধিকার প্রদান

এ ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিষদ শক্তিশালী ভূমিকা পালনে সক্ষম বলে অনেকের বিশ্বাস। গত ২৭-৩১ ডিসেম্বর, ১৯৮৬ সনে অনুষ্ঠিত টীম বিল্ডিং কোর্সের অন্যতম সুপারিশ ছিল যে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক ভোটাধিকার ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে সরকারী সদস্যদের ভোটাধিকার প্রদান করা

উচিৎ। কিন্তু ভোটাধিকার প্রাপ্ত সরকারী সদস্যদের মোট সংখ্যা প্রতিনিধি সদস্যদের মোট সংখ্যার চেয়ে বেশী হবে না।[১৬] অনুরূপভাবে উল্লেখিত ৫টি উপজেলার সরকারী সদস্যগণ তাদের ভোটাধিকার প্রদানের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

৪০ জন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের মধ্যে ৩৬ জন (৯০%) সরকারী সদস্যদের ভোটাধিকার প্রদানের বিরুদ্ধে মত ব্যক্ত করেছেন। তাদের যুক্তি নিম্নরূপ ঃ

(১) যদি সরকারী সদস্যদেরকে এরূপ অধিকার দেয়া হয়, তবে তারা বেসরকারী সদস্যদের উপর কর্তৃত্ব করবেন। (২) সরকারী সদস্যরা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নন। (৩) যেহেতু তারা স্থানীয় এলাকার অধিবাসী নন, সেহেতু তারা স্থানীয় চাহিদা ও সমস্যা সম্পর্কে তত বেশী জ্ঞাত নন।

যে ৪ জন চেয়ারম্যান সরকারী সদস্যদের ভোটাধিকার প্রদানের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন তারা যুক্তি দেখিয়েছেন যে পরিষদে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এরূপ ভোটাধিকার প্রদান আবশ্যক। অন্যথায় পরিষদ ভোটাধিকার প্রাপ্ত সদস্যদের বিশেষ করে প্রতিনিধি সদস্যদের ক্রীড়ানক হবে। এ প্রসঙ্গে ভারত ও থাইল্যাণ্ডের স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন এর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা যেতে পারে। স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রধানগণ সবসময় তাদের নিজ দল ও এলাকার সর্বাধিক সুবিধা আদায়ের স্বার্থে সরকারী কর্মচারীদেরকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। তাই দেখা যায় যে গ্রামীণ ক্ষমতা এলিটগণ বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা ও উন্নয়নকে তাদের নিজ গ্রুপের স্বার্থে ব্যবহার করার প্রয়াস পায়।[১৭]

টীম বিল্ডিং কোর্সের সুপারিশের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো প্রয়োগিক। কোন কোন সরকারী সদস্যকে ভোটাধিকার প্রদান করা হবে তা নির্ধারণ করা নিঃসন্দেহে জটিল ব্যপার।

(গ) বাধ্যবাধকতা পালনের দায়িত্ব (Accountability)

বর্তমানে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও প্রতিনিধি সদস্যদের বাধ্যবাধকতা পালনের কার্যকর দায়িত্ব নেই বললেই চলে। ফলে পরিষদ অনেক সময় তাদের স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হতে পারে। এজন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা যেতে পারে ঃ

(১) উপজেলা পরিষদের নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ স্থির করা অতীব প্রয়োজন। নির্বাচিত জেলা পরিষদই উক্ত কর্তৃপক্ষ হতে পারে।

(২) উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও প্রতিনিধি সদস্যদের জবাব-দিহি করার একটা সুনির্দিষ্ট ও কার্যকরী পদ্ধতি প্রবর্তন করা প্রয়োজন। তাহলে পরিষদে ভারসাম্য পরিলক্ষিত হবে।

(২) উপজেলা পরিকল্পনার পদ্ধতিগত ত্রুটি নিরসন

উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার পদ্ধতিগত ত্রুটি নিরসনকল্পে খাতওয়ারী ভিত্তিক পরিকল্পনা পদ্ধতির পাশাপাশি এলাকা ভিত্তিক পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এ জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন খাতওয়ারী অর্থ বরাদ্দের ন্যূনতম ও সর্বোচ্চ সীমা তুলে দেয়া। উপজেলার সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগতভাবে অনুন্নত এলাকাগুলোতে উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে হবে। এলাকা ভিত্তিক পরিকল্পনা পদ্ধতির ওপর প্রয়োগিক গবেষণা করা প্রয়োজন।

(৩) উপজেলা পর্যায়ে সঠিক তথ্য পদ্ধতি প্রবর্তন করা

উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য যে সব তথ্যাবলী প্রয়োজন সেগুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ

(১) উপজেলার প্রাকৃতিক পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য
(২) উপজেলার জনসাধারণ ও জনতত্ত্ব সম্পর্কিত তথ্য
(৩) উপজেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার তথ্য

প্রথমতঃ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসকে লীড (Lead) এজেন্সী হিসাবে নির্বাচন করা প্রয়োজন। এই এজেন্সীর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, সংগৃহীত তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ ও বিস্তার করা যেতে পারে। যে সব উপজেলায় এখনো আর্থ-সামাজিক অবস্থার জরীপ কাজ সম্পন্ন করা হয়নি সেখানে জরুরী ভিত্তিতে জরীপ কাজ পরিচালনা করা আবশ্যক। লীড এজেন্সীর কাজ তত্ত্বাবধান ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসার প্রমুখকে নিয়া উপজেলা তথ্য কমিটি গঠন করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে তথ্য সংগ্রহের কাজে সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হবে। এ ছাড়া জাতীয় সরকারের উপজেলা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাবলী যথাসময়ে উপজেলা পরিষদে পাঠানো আবশ্যক।

(৪) পরিকল্পনা ও উন্নয়নে ব্যাপক ও প্রয়োজন ভিত্তিক প্রশিক্ষণদান

উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা ও মানসিকতার বিকাশের জন্য ব্যাপক ও প্রয়োজন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালিত সিনিয়র সহকারী সচিব, ইউ,এন,ও প্রমুখের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কোর্সের কথা উল্লেখযোগ্য। এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ৬টি কোর্সে মোট ১৮২ জন অংশ গ্রহণকারীর মধ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সংখ্যা ছিল ৬৯ (৩৮%)। যেহেতু উপজেলা পর্যায়ের কর্ম-কর্তাদের মধ্য থেকে একমাত্র ইউ,এন,ও এই কোর্সে অংশগ্রহণ করেন এবং এখনো

প্রায় ৪০০ জন ইউ,এন,ও-র উক্ত কোর্সে প্রশিক্ষণ হয়নি, সেহেতু অধিক সংখ্যক ইউ,এন,ওকে (মোট অংশগ্রহণকারীর কমপক্ষে ৫০%) এই কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে যাতে তারা তাদের লব্ধ জ্ঞানকে উপজেলার অন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে বিস্তার ঘটাতে পারেন। প্রসঙ্গতঃ উপজেলা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন-এর ওপর অবিচ্ছিন্ন প্রশিক্ষণের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসাবে উপজেলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্রকে ব্যবহার করা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে। উক্ত কোর্স সম্পর্কে আরো কিছু সুপারিশ করা গেল ঃ (ক) প্রজেক্ট সাসটেইন-এবিলিটির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা ; (খ) বিকেন্দ্রীকরণ ও উপজেলা পদ্ধতি শীর্ষক একটি মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা ; ও (গ) কোর্সের মেয়াদ ২ মাস থেকে বাড়িয়ে ৩ মাস করা। অনুরূপভাবে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে বিকেন্দ্রী-করণ ও উপজেলা পদ্ধতির ওপর একটি মডিউল থাকা আবশ্যক। সর্বোপরি, উপজেলা পর্যায়ে জনপ্রতিনিধি ও সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের উন্নতি বিধানের জন্য টীম বিল্ডিং কোর্সের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

উপজেলা প্রশাসনের কাঠামো

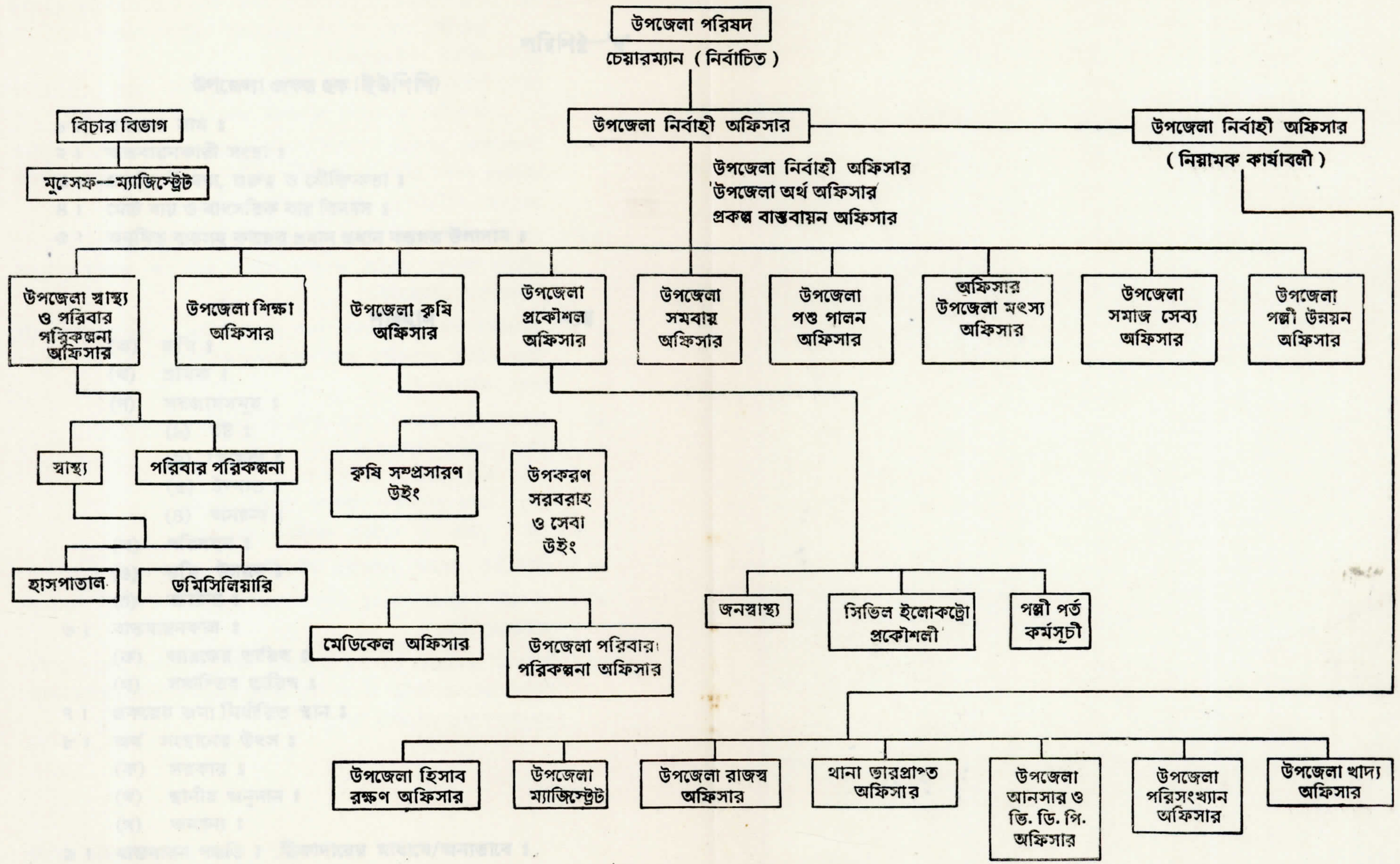

পরিশিষ্ট—'খ'

উপজেলা প্রকল্প ছক (ইউপিপি)

১। প্রকল্পের নাম ঃ

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ

৩। প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা ঃ

৪। মোট ব্যয় ও বাৎসরিক ব্যয় বিন্যাস ঃ

৫। অনুমিত ব্যয়সহ কাজের প্রধান প্রধান বস্তুগত উপাদান ঃ

	পরিমান	ব্যয়
(ক) জমি ঃ		
(খ) শ্রমিক ঃ		
(গ) সরঞ্জামসমূহ ঃ		
(১) ইট ঃ		
(২) সিমেন্ট ঃ		
(৩) ইস্পাত ঃ		
(৪) অন্যান্য ঃ		
(ঘ) পরিবহন ঃ		
(ঙ) ভূমি উন্নয়ন ঃ		
(চ) অন্যান্য ঃ		

৬। বাস্তবায়নকাল ঃ

(ক) আরম্ভের তারিখ ঃ

(খ) সমাপ্তির তারিখ ঃ

৭। প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত স্থান ঃ

৮। অর্থ সংস্থানের উৎস ঃ

(ক) সরকার ঃ

(খ) স্থানীয় অনুদান ঃ

(গ) অন্যান্য ঃ

৯। বাস্তবায়ন পদ্ধতি ঃ ঠিকাদারের মাধ্যমে/অন্যভাবে ঃ

১০। জনশক্তির প্রয়োজন ঃ

(ক) দক্ষ ঃ

(খ) অদক্ষ ঃ

১১। সমাপ্তির পর প্রকল্পকার্য অথবা সুবিধাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা ঃ

(ক) কর্মচারীর বার্ষিক চাহিদা এবং তাঁহাদের প্রশিক্ষণ ঃ

(খ) রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য যন্ত্রাংশ ও নিঃশেষে ব্যবহার্য দ্রব্যাদি এবং অন্যান্য সরঞ্জামের বার্ষিক চাহিদা ঃ

(গ) বার্ষিক পৌনঃপুনিক ব্যয় ঃ

(ঘ) পৌনঃপুনিক ব্যয়ের জন্য অর্থ সংস্থান এবং প্রয়োজনীয় জনশক্তি ও দক্ষতা সংগ্রহের জন্য প্রস্তাবিত পদ্ধতি ঃ

১২। উপজেলাতে জাতীয় সরকার কিংবা আঞ্চলিক সংস্থা কর্তৃক গৃহীত অনুরূপ কোন প্রকল্প আছে কি ? যদি থাকে তাহা হইলে প্রকল্পটি গ্রহণের যৌক্তিকতা উল্লেখ করিতে হইবে ঃ

১৩। প্রস্তাবিত বিনিয়োগ হইতে পূর্ণ সুফল লাভ করিতে হইলে উপজেলা পরিষদ কিংবা জাতীয় সরকার কর্তৃক অন্য কি ধরণের সম্পূরক বিনিয়োগের প্রয়োজন ?

১৪। প্রকল্পটির জন্য জমি দখল করা প্রয়োজন কি ? যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে প্রকল্পটির জন্য জমি দখলের উদ্দেশ্যে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে ?

১৫। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট অনুমিত/প্রত্যাশিত সুফল ঃ

(ক) অর্থের হিসাবে ঃ

(খ) কর্মসংস্থানের হিসাবে ঃ

(গ) আর্থ-সামাজিক কল্যাণ (বর্ণনা করুন) ঃ

(ঘ) সুফল ও ব্যয়ের অনুমিত অনুপাত ঃ

১৬। প্রকল্পটির ধারণা কিভাবে হইয়াছিল ?

১৭। প্রকল্পটি সূচনা করার পূর্বে কোনরূপ জরীপ/সমীক্ষা চালানো হইয়াছে কি ?

১৮। প্রকল্পটি প্রণয়নের ব্যাপারে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ গ্রহণের জন্য প্রদত্ত সংশোধিত নির্দেশনামালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হইয়াছে কি ?

উদ্যোগ গ্রহণকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট—'গ'

তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৮৫-৯০

(উপজেলা উন্নয়ন সম্পর্কিত কতিপয় তথ্যাবলী) ঃ

সেচ

১। - - - - - - - - - - - উপজেলা পরিষদ ৩·৪৫ লাখ একর জমিতে সেচ করবে। (পৃঃ-১৯৮)।

২। প্রতিটি উপজেলায় সেচের জন্য সর্বাধিক ৫,০০০ একরের এবং পানি নিষ্কাশন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ১০,০০০ একরের ছোট প্রকল্প নেয়া হবে। পরিকল্পনায় এ ধরনের প্রায় ৫০০টি প্রকল্পের ব্যবস্থা রয়েছে। ছোট ছোট প্রকল্পের প্রকৌশল ও কারিগরি দিক বিডব্লিউডি স্থানীয় জনসাধারণের সাথে আলাপ আলোচনা করে নির্ধারণ করবে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব উপজেলা পরিষদের উপর অর্পণ করা যেতে পারে। (পৃঃ-১৯৯)।

পশুশক্তির বংশগত উন্নয়ন

৩। কৃত্রিম প্রজনন ও অন্যান্য স্বাভাবিক ব্যবস্থায় উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে বর্তমানে আমাদের যে দেশীয় পশু রয়েছে তাদের বংশমানের উন্নয়ন করা হবে। স্বাভাবিক ব্যবস্থায় প্রত্যন্ত ও দুর্গত অঞ্চলসমূহে উন্নত প্রজননক্ষম ষাড় সরবরাহ করা হবে। এসব ষাঁড়ের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকবে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের ওপর। - - - - - - গ্রাম পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে বংশগত উন্নয়নের কৌশল প্রসারিত করার জন্য উপজেলায় অবস্থিত প্রতিটি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের দু'জন সরকারী প্রজননকারী কৃত্রিম প্রজননের জন্য পূর্ব ব্যবস্থা মোতাবেক ইউনিয়ন পর্যায়ে সফর করবেন। (পৃঃ ২০৬-২০৭)।

খামার বনায়ন

৪। - - - - - - - - - - উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দান করে তাদের মাধ্যমে জনগণের কাছে চারাগাছ সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে সকল উপজেলায় নার্সারী ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। ডি,এই'র অধীনস্থ ইউনিয়ন পর্যায়ের সম্প্রসারণ কর্মী ও স্থানীয় বেসরকারী চারা রোপনকারীদের জন্য এই নার্সারীগুলো প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে। এই নার্সারীগুলো থেকে জনসাধারণের মধ্যেও চারাগাছ সরবরাহ করা হবে। (পৃঃ ২২২)।

৫। - - - - - - - - - - - প্রযুক্তিগত অগ্রগতি বিধানে তৃতীয় পরিকল্পনায় সীমিত পরিসরে উপজেলা কর্মসংস্থান সম্পদ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার একটি নতুন উদ্যোগ গ্রহণের চেষ্টা করা হবে। (পৃঃ ২৩৫)।

৬। প্রতিটি উপজেলায় সমন্বিত সেবাকেন্দ্র তথা বাজারের ন্যূনতম মান বজায় রেখে অন্ততঃ একটি পল্লী গ্রোথ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হবে। (পৃঃ ২৩৫)।

পাদটিকা

১। হাসানাত আব্দুল হাই, লোকাল লেভেল প্লানিং ইন বাংলাদেশ, (ঢাকা ঃ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্ণমেন্ট, মার্চ ১৯৮২), পৃষ্ঠা—৫-৬।

২। জি, শাহ, ডিসেন্ট্রলাইজড প্লানিং ইন এ সেন্ট্রালাইজড ইকোনমী ঃ এ স্টাডি অব সর্বোদয়া প্রোগ্রাম ইন এ তালুক ইন পিটার বর (সম্পাদিত), রুরাল সাউথ এশিয়া, লিনকেজ, চেঞ্জ এন্ড ডেভেলপমেন্ট, লণ্ডন, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা ২০৪।

৩। পরিকল্পনা কমিশন, তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৮৫–৯০। ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ১৪১।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, রিপোর্ট অফ দি কমিটি ফর এডমিনিস্ট্রেটিভ রিঅরগানাইজেশন/রিফর্ম, জুন, ১৯৮২।

৫। স্থানীয় সরকার বিভাগ, উপজেলা কর্তৃক গৃহীত উন্নয়নপ্রকল্পসমূহের মূল্যায়ন প্রতিবেদন ১৯৮৩-৮৪ ও ১৯৮৪-৮৫ অর্থ বৎসর, ঢাকা, আগস্ট, ১৮৯৬, পৃষ্ঠা (ক)।

৬। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, এ হ্যাণ্ডবুক ফর উপজেলা ট্রেনিং, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ৩৪। পরবর্তীকালে বিষয়গুলোর সামান্য পরিবর্তন হয়েছে।

৭। দৈনিক সংবাদ, ৪ঠা জুলাই, ১৯৮৬।

৮। বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভাগ, উপজেলা উন্নয়ন কার্যক্রম মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা, ১২।

৯। ডি, এস, ইউসুফ হায়দার, ডেভেলপমেন্ট—দি উপজেলা ওয়ে, (ঢাকা, ঢাকা প্রকাশন, ১৯৮৬), পৃষ্ঠা ১৫৯)।

১০। পরিকল্পনা কমিশন, উপজেলা পরিষদের জন্য নির্দ্দেশনামালা ঃ জাতীয় সরকার কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহারের জন্য অনুসরণীয় (জুলাই, ১৯৮৩), পৃষ্ঠা ৪–৫।

১১। পরিকল্পনা কমিশন, উপজেলা পরিষদের জন্য নির্দ্দেশনামালা ঃ জাতীয় সরকার কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহারের জন্য অনুসরণীয় (জুলাই, ১৯৮৫-তে সংশোধিত), পৃষ্ঠা ৪–৫।

১২। বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভাগ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৯।

১৩। পরিকল্পনা কমিশন, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫।

১৪। পরিকল্পনা কমিশন, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১১

১৫। পরিকল্পনা কমিশন, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬

১৬। এ, এম, এম, শওকত আলী, পলিটিক্স, ডেভেলপমেন্ট এণ্ড উপজেলা (ঢাকা ঃ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্ণমেন্ট, (১৯৮৬), পৃষ্ঠা–১৩৯-১৪১

১৭। বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভাগ, পূর্বোক্ত, পৃষ্টা-৯

১৮। দৈনিক সংবাদ, ৫ই জুন, ১৯৮৬।

১৯। স্থানীয় সরকার বিভাগ, পূর্বোক্তা, পৃষ্ঠা ৭১।

২০। বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভাগ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২।

২১। আতিউর রহমান, রুরাল পাওয়ার স্টাকচার, (ঢাকা ঃ বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল, ১৯৮১) পৃষ্ঠা ঃ ২৭-৩০।

২২। আর, পি, মিশ্র ও অন্যান্য, রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট প্লানিং ইন ইণ্ডিয়া। নিউ দিল্লী ঃ ভিকাশ পাবলিশিং হাউস প্রাঃ লিঃ, ১৯৭৪)

২৩। এ, কে, এম, গোলাম রব্বানী, "ডাটা এণ্ড ইনফরমেশন ফর লোকাল লেভেল প্লানিং", বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ডায়ালগ, ১৯৮৩ ঃ ২২

২৪। ইউ, কে, হিকস, ডেভেলপমেন্ট ফ্রম বিলো। (অক্সফোর্ড ঃ দি ক্লারানডন প্রেস, ১৯৬১) পৃষ্ঠা ৫০৫।

২৫। আবু আহম্মদ আব্দুল্লাহ, লোকাল লেভেল প্লানিং ঃ র‍্যাসনেল অবজেকটিভস এণ্ড মোডালিটিস (খসড়া প্রধান রিপোর্ট, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান), আগষ্ট ৬, ১৯৮৫।

২৬। সৈয়দ নকীব মুসলিম ও মোশারফ হোসেন, ফ্রম ফরমাল টু ইনফরমাল, এ রিপোর্ট অন টিম বিল্ডিং কোর্স, (সাভার, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৮৭), পৃষ্ঠা ৫১।

২৭। এ পি ডি সি, প্রজেক্ট রিভিউ মিটিং অন ডিসেন্ট্রালাইজেশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট, (কুয়ালালামপুর, ২৯শে সেপ্টেম্বর—৩রা অক্টোবর ১৯৮৬), পৃষ্ঠা ৭৪-৭৫।

বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নের জন্য বিকেন্দ্রীকরণ

ডঃ আকবর আলী খান

অনুবাদ—মোঃ আমিনুল ইসলাম ভূইয়া

সূচনা

বাংলাদেশে জাতিস্বত্বার যন্ত্রণাকর ও দীর্ঘস্থায়ী অনুসন্ধান সাংবিধানিক পদ্ধতির মাধ্যমে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়নি। বাংলাদেশ মর্মান্তিক বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করে; এটা শুধুমাত্র একটি বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশই ছিল না, বরং টমাস জেফারসন যাকে "সরকারের অধঃপতন" বলেছেন তার বিরুদ্ধচারিতাও ছিল।[১] জেফারসনের দৃষ্টিতে একটি আদর্শ সরকার শুধুমাত্র অনেকের শক্তিকেই বাড়িয়ে তোলে না, বরং নিজেদের যোগ্যতার পরিধিতে সবার শক্তিকেই বৃদ্ধি করে। সকল ক্ষমতা যখন "এক বা গুটিকয়েক ব্যক্তি, উচ্চ বর্ণের মানুষজন এবং অনেকের হাতে পুঞ্জীভুত হয়" তখনই সরকারের অধঃপতন ঘটে। এ অধঃপতন হতে উত্তরণের পথ হচ্ছে "অনেককে" প্রতিষ্ঠানে বিভক্ত করা যেখানে "প্রত্যেকেই" অন্যকে গণ্য করে এবং নিজে গণ্য হয়। সরকারী ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং জনগণের অংশগ্রহণ পৃথিবীর সর্বত্রই বিপ্লবীদের মধুরতর স্বপ্ন ছিল।

বাংলাদেশে বিপ্লবের আশা আকাঙ্খা সংবিধানের মধ্যেই রূপ লাভ করেছে। সংবিধানের ১৪ ধারায় ঘোষণা করা হয়েছে যে রাষ্ট্রের একটি মৌলিক লক্ষ্য হচ্ছে "সব ধরনের শোষণ হতে মেহনতি জনতা, কৃষক-শ্রমিক ও জনগণের পশ্চাৎপদ অংশের মুক্তি।" সংবিধানের ১৬ ধারা মতে গ্রামীণ ও শহুরে এলাকার মধ্যে বৈষম্য হ্রাস এবং "পল্লী এলাকার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও- - -" সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসেবে নির্দেশিত হয়েছিল। ১৯ ধারা "মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার জন্য" কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা নির্দেশ করে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন এবং জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশ গ্রহণ জাতীয় মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হয়।

এই প্রবন্ধটিতে মেহনতি জনতার মুক্তির আড়ম্বরপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগের কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা হবে। এটি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। বাংলাদেশে বিকেন্দ্রীকরণ ও পল্লী উন্নয়নের

প্রচেষ্টাকে যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ প্রভাবিত করে তা' প্রথম অধ্যায়ে বিধৃত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে পল্লী উন্নয়নের জন্য তৃণমূল পর্যায়ে সমবায় প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির জন্য সরকারের নেয়া উদ্যোগের পর্যালোচনা। তৃতীয় অধ্যায়ে পর্যালোচিত হয়েছে স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক উদ্ভাবনসমূহ যা বিকেন্দ্রীকরণকে ত্বরান্বিত করার জন্য কার্যকর করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ (এন,জি,ও) কর্তৃক পরিচালিত কার্যকরী বিকেন্দ্রীকরণের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষাসমূহ। বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নের জন্য বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচীর বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পঞ্চম অধ্যায়ে নিরীক্ষিত হয়েছে। বাংলাদেশের একটি এন,জি,ও-গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সফল উদ্ভাবনার উপর লিখিত একটি ঘটনা সমীক্ষার অভিমতের সংক্ষিপ্তসার ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিধৃত হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে প্রধান প্রধান প্রতিপাদিত বিষয়গুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে এবং এই সমীক্ষার নীতিগত তাৎপর্য কি তা বর্ণনা করা হয়েছে।

১। সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশ

বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র দেশ (আয়তন ১৪৪ হাজার বর্গ কিলোমিটার; আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের ৮৯তম দেশ), কিন্তু তার দারিদ্রের পরিধি ব্যাপক। বাংলাদেশ হচ্ছে স্বল্পোন্নত দেশের (এল,ডি,সি) মধ্যে সবচে' জনবহুল দেশ এবং জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীর অষ্টম বৃহৎ দেশ। পুরাদস্তর বঞ্চনার মধ্যে বেঁচে আছে এর দুই তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী। সরকারী হিসেব মতে জনগোষ্ঠীর শতকরা ৭৩ ভাগ মানুষ গড় প্রয়োজনীয় (প্রতিদিন ২২০০ কিঃ কেলোরী) কেলোরী থেকে কম আহার গ্রহণ করে (সারণী-১)।

সারণী—১
দারিদ্রসীমার নীচে কেলোরী গ্রহণকারী জনসংখ্যা ও খানার শতকরা হার
১৯৮১-৮২

প্রতিদিন কেলোরী গ্রহণ (কিঃ কেলোরী)	বাংলাদেশে খানার শতকরা হার			বাংলাদেশে জনসংখ্যার শতকরা হার		
	বাংলাদেশ	শহর এলাকা	পল্লী এলাকা	বাংলাদেশ	শহর এলাকা	পল্লী এলাকা
১৬০০-এর নীচে	২৯	১৯	৩১	৩০	২১	৩১
১৮০০-এর নীচে	৪৪	৩৪	৪৫	৪৫	৩৭	৪৭
২২০০-এর নীচে	৭১	৬৩	৭৩	৭৩	৬৭	৭৪

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ খানা খরচ জরিপ প্রতিবেদন, ১৯৮১-৮২ (ঢাকাঃ বিবিএস, ১৯৮৬), পৃঃ ৪৪।

যা হোক, বাংলাদেশে দারিদ্রের প্রবণতা নিয়ে মত পার্থক্য রয়েছে। একটি সমীক্ষায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে যে বাংলাদেশে "অতি দরিদ্রের শতকরা হার ১৯৬৩-৬৪ সালে ছিল ৪০·২ ; ১৯৭৫ সালে তা ৬১·৮-এ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। দরিদ্রের ক্রমবর্ধমান দুর্দশার এই অনুকল্প অন্য একটি সমীক্ষা দ্বারাও সমর্থিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে অতি দরিদ্রের (যারা গড়ে প্রতিদিন ২০৮৭ কিঃ-কেলোরীর নীচে খাবার গ্রহণ করে) শতকরা হার ১৯৬৩-৬৪তে ছিল ৫২ এবং তা ১৯৭৭-৭৮ এ বৃদ্ধি পেয়ে ৬৭·৯তে দাঁড়িয়েছে।[৩] যাহোক, তৃতীয় একটি সমীক্ষার সাথে এসব প্রতিপাদিত বিষয়গুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাতে নির্দেশিত হয়েছে যে, গ্রাম বাংলায় ১৯৬৩-৬৪তে দরিদ্ররা ছিল শতকরা ৯২ ভাগ এবং ১৯৭৩-৭৪-এ তা নেমে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৮৩-তে।[৪] অন্যদিকে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত সর্বশেষ খানা-খরচ জরীপে দেখা যায় যে, ১৯৭৩-৭৪ এবং ১৯৮১-৮২ সালের মধ্যে দারিদ্রসীমার নীচে জনসংখ্যা এবং খানার হারের মধ্যে পরিসংখ্যানগত কোন উল্লেখযোগ্য তারতম্য নেই।[৫] ধরা যেতে পারে যে "দারিদ্র্য রেখা"-র সংজ্ঞা সম্পর্কে ঐক্যমতের অভাবের জন্যই এসব হিসেবে বিপুল তারতম্য দেখা যায়।

যদি এটাও মনে করা হয় যে, গত দশকে দরিদ্রের অনুপাত স্থির রয়েছে, তবু বলা যায় যে দারিদ্র্য সীমার নীচে মানুষজনের সংখ্যা বেড়ে গেছে, যেহেতু জনসংখ্যার নাটকীয় বৃদ্ধি ঘটেছে (বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের মতে বছরে শতকরা ২·৪)। বিশ্বব্যাংকের একটি সমীক্ষার হিসেব মতে যদিও পুরো জন-সংখ্যার বিচারে দারিদ্রের আনুপাতিক হার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়নি তবু ১৯৭৪ সালের তুলনায় ১৯৮১ সালে ৮ মিলিয়ন দরিদ্র জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।[৬] আরো আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে দারিদ্রের ব্যাপ্তি সত্ত্বেও গড় আয়ু বেড়ে গেছে। ১৯৬০ সালে জন্মকালে সম্ভাব্য গড় আয়ু ছিল ৩৭ বৎসর ; ১৯৮৬ সালে বেড়ে হয়েছে ৫০ বৎসর। জীবনমান উন্নয়নের বদলে জীবন রক্ষাকারী ঔষধ ও নিবারণ ব্যবস্থার অধিকতর ব্যবহারই বর্ধিত সম্ভাব্য গড় আয়ুর কারণ বলে ধরা যেতে পারে। মৃত্যুহারের হ্রাস জনসংখ্যা বিস্ফোরণে তার ভূমিকা রেখেছে যা অর্থনীতিকে নিম্নস্তরের ভারসাম্য ফাঁদে জড়িয়ে ফেলেছে।

আপাতদৃষ্টিতে সমরূপ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে দরিদ্ররা সমরূপী নয়। দরিদ্রদের নিজেদের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পার্থক্য রয়েছে। মাইকেল লিপটনের মতে বাংলাদেশের দরিদ্রদেরকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় : (১) "অচরম দরিদ্র" এবং (২) "চরম দরিদ্র"।[৭] বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তাদেরকেই "চরম দরিদ্র" বলে আখ্যায়িত করা যায় যাঁরা প্রতিদিন ১৬০০ কিঃ কেলোরীর (মৌলিক বিপাকীয় কেলোরী প্রয়োজনীয়তা) চাইতে কম আহার গ্রহণ করে। যাঁরা গড় কেলোরী প্রয়োজনীয়তার শতকরা ৮৫ ভাগ (প্রতিদিন ১৮০০ কিঃ কেলোরী) গ্রহণ করে তাঁদেরকে অচরম দরিদ্রের ভাগে ফেলা যেতে পারে। এই বিন্যাস

অনুসারে বাংলাদেশে কম পক্ষে শতকরা ৩০ ভাগ লোক চরম দরিদ্র (সারণী-১ দেখুন)। শুধুমাত্র শতকরা ১৫ ভাগ লোক অচরম দরিদ্র। ফলে বাংলাদেশে চরম দরিদ্রদের সমস্যা অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিকতর তীব্র ও গভীর।

এমনকি চরম দরিদ্র পরিবারেও দারিদ্র্য সবাই সমভাবে ভোগ করে না। ধনী ও দরিদ্র উভয় প্রকার পরিবারেই শিশু এবং মহিলাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। ফলে বাংলাদেশে জন্ম হতেই বহু সংখ্যক শিশু অপুষ্টিতে ভোগে। চার বছর বয়স পর্যন্ত চার ভাগের তিন ভাগ শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং তারা রক্তাল্পতায় ভোগে। কোন একটি বছরে জন্ম নেয়া শিশুদের শতকরা ২০ ভাগেরও কম শিশু স্বাস্থ্যবান, শারীরিকভাবে কর্মক্ষম এবং পুরোপুরি উৎপাদনক্ষম নাগরিক হওয়ার সুযোগ পায়।[৮] মহিলারাও অপুষ্টিতে ভোগে। "ধনী বা দরিদ্র, হিন্দু বা মুসলমান যা-ই হোক না কেন একটা বিপত্তি তাদের সবার ক্ষেত্রেই সমান—সবার শেষে খাওয়া এবং প্রায়শঃই সবচে' কম খাওয়া—।"[৯] পূর্ণ বয়স্ক নারীদের কেলোরী গ্রহণ (গর্ভ ও স্তনদান প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনায় না এনেই) পুরুষদের তুলনায় ২৯% ভাগ কম এবং ৫ বছরের নীচে মেয়ে শিশুদের ক্ষেত্রে ১৬% কম এবং ৫-১৪ বছরের মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রায় ১১% কম। ছেলে শিশুদের চাইতে মেয়ে শিশুদের অপুষ্টির হার প্রায় ৩ গুণ বেশী এবং তীব্র অপুষ্টিতে ভোক্তাদের বেলায় মৃত্যু হার ৪৫% ভাগ বেশী।[১০] দারিদ্রের এই উত্তরোত্তর ব্যাপকত্বের সাথে রয়েছে আয় এবং সম্পদের বৈষম্যের বৃদ্ধি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আয় বন্টনের জিনি সূচক ১৯৬৩-৬৪তে ছিল ০.৩৬ এবং ১৯৮১-৮২তে তা' বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ০.৩৯তে (সারণী-২)।

সারণী-২

খানা জনসংখ্যা প্রতি দশক-এ আয়ের শতকরা হার
১৯৬৩-৬৪,১৯৭৩-৭৪ এবং ১৯৮১-৮২

খানা দশক	বাংলাদেশ			শহর			পল্লী		
	১৯৬৩-৬৪	১৯৭৩-৭৪	১৯৮১-৮২	১৯৬৩-৬৪	১৯৭৩-৭৪	১৯৮১-৮২	১৯৬৩-৬৪	১৯৭৩-৭৪	১৯৮১-৮২
সর্বনিম্ন ৫%	১·২	১·২	১·১২	১·০	১·৬	১·০৯	১·৩	০·৮	১·১৬
দশক-১	১·২	২·৮	২১·৬	২·৮	৩·২	২·৬৯	৩·৩	২·৪	২·৮৪
দশক-২	৪·৫	৪·২	৩·৮৮	৩·৬	৩·৬	৩·৫২	৫·২	৪·৮	৪·২৭
দশক-৩	৪·৬	৫·৪	৪·৮৩	৪·৫	৫·২	৪·৩৯	৫·৩	৫·৬	৫·৩৪
দশক-৪	৬·১	৫·৯	৫·৮৯	৫·৮	৫·৮	৫·৪৭	৫·৮	৬·৩	৬·৩৭
দশক ১-৪	১৮·৪	১৮·৩	১৮·৪৮	১৬·৭	১৭·৮	১৬·০৭	১৯·৬	১৯·১	১৮·৮২
দশক-৫	৭·৩	৭·১	৬·৯৩	৫·৯	৭·২	৬·৪৪	৮·৩	৭·১	৭·৪৭
দশক-৬	৭·৩	৮·০	৮·২৭	৭·৫	৮·৮	৭·৮৯	৮·৩	৮·০	৮·৭১
দশক-৭	১০·৭	১০·০	৯·৯৫	৮·৯	১০·০	৯·৬৭	১০·০	৯·৮	১০·২৬
দশক-৮	১০·৬	১২·৮	১২·১৭	১১·৫	১২·০	১২·০২	১১·৮	১৩·৫	১২·৩০
দশক-৯	১৪·৭	১৬·০	১৫·৭৯	১৬·৫	১৬·০	১৫·৮৪	১৫·০	১৬·১	১৫·৭৩
দশক-১০	৩১·০	২৮·৪	২৯·৫৩	৩৩·০	২৯·২	৩২·০৬	২৭·০	২৬·৪	২৬·৬৯
সর্বোচ্চ ৫%	২০·৪	১৬·৪	১৮·৯৫	২১·১	১৮·৬	২০·৮৯	১৭·২	১৬.০	১৬.৭৮
জিনি সূচক	০·৩৬	০·৩৬	০·৩৯	০·৪১	০·৩৮	০·৪১	০·৩৩	০·৩৬	০·৩৬

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বাংলাদেশ খানা ব্যয় জরিপ প্রতিবেদন ১৯৮১-৮২, পৃঃ ২০।

সর্বনিম্ন শতকরা ৪০ ভাগ খানার ক্ষেত্রে মোট আয়ে তাঁদের অংশ ১৯৬৩-৬৪তে ছিল শতকরা ১৮·৪ ভাগ এবং ১৯৮১-৮২তে তা' দাঁড়িয়েছে ১৭·৩৬ ভাগে (সারণী-২)। ভূমি বন্টনের ক্ষেত্রে একই ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ১৯৭৭ সালে সর্বনিম্ন শতকরা ৪০ ভাগ কৃষি খানা শতকরা মাত্র ১৩·৩ ভাগ জমি চাষ করত। পুরো আবাদী ভূমির ক্ষেত্রে এই গ্রুপের অংশ ১৯৮৩-৮৪ সালে শতকরা ৭·৬ ভাগে নেমে যায় (সারণী-৩)।

সারণী-৩

বাংলাদেশে প্রধান কৃষি খানা গ্রুপ কর্তৃক জমি আবাদের বন্টন
১৯৭৭-৮৪

গ্রামীণ খানার শতকরা বর্গ		১৯৭৭ জমি আবাদ (০০০ একর)	শতকরা হার	১৯৮৩-৮৪ জমি আবাদ (০০০ একর)	শতকরা হার
সর্বনিম্ন	৪০%	২৯২৫	১৩·৩	১৭১৪	৭·৬
নিম্নমধ্য	৪০%	৭৯৪৫	৩৬·১	৮১৭৪	৩৬·১
উচ্চমধ্য	১৫%	৬৩০১	২৮·৭	৬৮৪৬	৩০১·১
উচ্চ	৫%	৪৭৮৮	২১·৯	৫৯৪৪	২৬·২
মোট	১০০%	২১৯৫৯	১০০·০০	২২৬৭৬	১০০·০

সূত্র : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ কৃষি ও গবাদি পশু শুমারী, ১৯৮৩-৮৪ (ঢাকা, বিবিএস, ১৯৮৬), পৃঃ-৩২।

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থার আরেকটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হচ্ছে ব্যাপক ভাগ চাষ। শতকরা প্রায় ২৪ ভাগ জমি বর্গাচাষীরা চাষ করে। শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রেই প্রজাস্বত্ব চুক্তি বাৎসরিক এবং প্রজারা উৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগ পায়, যদিও তারা নিজেরাই সকল উপকরণের ব্যয় বহন করে। এতদ্‌পর্যন্ত নেয়া ভূমি সংস্কারের সমস্ত উদ্যোগই ছিল দায়সারা গোছের। ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ, ১৯৮৪-তে ভূমি মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা ১০০ বিঘা (প্রায় ৩৪ একর) থেকে হ্রাস করে ৬০ বিঘা (প্রায় ২০ একর) করা হয়েছে। যা হোক, এই সর্বোচ্চ সীমা শুধুমাত্র নতুন জমির স্বত্বাধিকারী হবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বিরাজমান মালিক যাঁদের জমি ২০ একরের অধিক তাঁদেরকে সেই অতিরিক্ত জমি রাখার ব্যাপারে অনুমতি দেয়া হয়েছে। ভাগ চাষের জন্য সকল মালিকদের চাষের খরচ প্রদান করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তবে এ সকল আইন এখনো কার্যে পরিণত করা হয়নি। সমভাবে কৃষি শ্রমিকদের জন্য সর্বনিম্ন মজুরী আইন এখনো নিষ্ক্রিয় আইন হিসেবেই বিরাজ করছে।

ভূমিহীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে উত্তরোত্তর এবং ফলে ধনী ও দরিদ্রের দূরত্ব দিন দিন বেড়েই চলেছে। ১৯৮৩-৮৪ সালের কৃষি ও গবাদি পশু শুমারী অনুসারে বাংলাদেশের শতকরা ৫৬·৪ ভাগ খানা ভূমিহীন। এই জরীপে তিন ধরনের ভূমিহীন চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথম ধরনে আছে সেই রকম খানা যাদের কোন ভূমিই নেই। এই মানদণ্ডে শতকরা ৮·৭ ভাগ খানা ভূমিহীন। দ্বিতীয় ধরনে রয়েছে সে সব খানা যাদের বসতবাটির জমি রয়েছে কিন্তু অন্য কোন জমি নেই। এই শ্রেণীতে রয়েছে শতকরা ১৬·৬ ভাগ খানা। তৃতীয় ধরনের ভূমিহীন খানায় রয়েছে তারা যাদের বসতবাটির জমি আছে এবং তাছাড়া অনধিক ০·৫০ একর অন্য জমি রয়েছে। এই শেষ শ্রেণীতে রয়েছে শতকরা ২৮·২ ভাগ খানা। প্রতি বছর প্রায় শতকরা ৫ ভাগ হারে ভূমিহীনতা বেড়ে যাচ্ছে। গত প্রজন্মে এটা প্রায় দ্বিগুণেরও অধিক বেড়ে গেছে এবং ধারণা করা যাচ্ছে যে এটা অপ্রতিরোধ্য গতিতে বেড়ে যাবে।

কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাব এই ভূমিহীনতার সমস্যাকে আরো বাড়িয়ে তুলছে। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের মতে ১৯৭৯-৮০ সালে ৮·৫ মিলিয়ন মানুষ কার্যতঃ কর্মহীন ছিল। প্রতি বছর নতুনভাবে ০·৮ মিলিয়ন নতুন লোক শ্রম বাজারে যুক্ত হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে বেকারের সংখ্যা সিরিয়া, সুইডেন, পর্তুগাল বা অষ্ট্রিয়ার পুরো জনসংখ্যার চাইতে অধিক। নরওয়ে, নিউজিল্যাণ্ড এবং ইসরাইলের যুক্ত জনসংখ্যার চাইতে এই বেকারদের সংখ্যা বেশী।

আয়ের অসম বন্টন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাব শুধুমাত্র সামাজিক কাঠামোর বিনাশই সাধন করে না বরং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে রুদ্ধ করে দেয়। জনগণের দারিদ্র ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস করে; ফলে বাজারের আয়তন সংকুচিত হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক বৈষম্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায়ও বিপত্তি ঘটায়। উদাহরণস্বরূপ বড় ভূস্বামীদের বর্গাচাষ প্রদান অপ্রতুল জমির দক্ষ ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করে। সমভাবে পানির উপর একাধিপত্য বা কৃষি উপকরণের উপর গ্রামীণ এলিট শ্রেণীর একচ্ছত্র আধিপত্য সেচ প্রকল্পগুলোর সেচ-এলাকার হ্রাস ঘটায়।

যে মেরুকরণ প্রক্রিয়া ধনীকে আরো ধনী, দরিদ্রকে আরো দরিদ্র করে তুলছে তা দারিদ্রের একটি কারণ এবং সেই সাথে এর পরিণামও বটে। দরিদ্রদের এবং বহিরাগত শুভাকাংখীদেরও এই শক্তিশালী বঞ্চনার ফাঁদ ছিন্ন করার কোন শক্তি নেই। স্থানীয় এলিটবর্গ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফায়দা নিজেরা কব্জা করে; তারা দরিদ্র ও বহিঃ বিশ্বের মাঝে "জাল" হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকার গ্রামীণ এলিটদের উপর পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, দুর্দশাগ্রস্থদের জন্য নির্ধারিত ত্রাণ সামগ্রী গায়েব হয়ে যায় এবং দরিদ্রদের জন্য চিহ্নিত কর্মসূচী স্থানীয় প্রভাবশালী লোকদেরকেই ধনী করে।[১১] এই শোষণ প্রক্রিয়া সর্বদাই অহিংস নয়। স্থানীয় এলিটবর্গ প্রায়শঃ আইন

বহির্ভূত পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের প্রভাব টিকিয়ে রাখে এবং রবার্ট চেম্বারস্ যাকে "ডাকাতি" বলেছেন, সময় সময় তারা তাতেই প্রবৃত্ত হয়।[১২] দরিদ্রদের লুণ্ঠন করার জন্য প্রতারণা, জোচ্চুরি এবং সহিংসতার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়; তাতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে। ১৯৭০-এর গ্রামীণ বাংলাদেশের ক্ষমতা কাঠামোর উপর একটি ঘটনা সমীক্ষায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, "মধ্য ও গরীব কৃষকদেরকে নিপীড়ণ করার ক্ষেত্রে আদালত ধনী কৃষকের একটি হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।"[১৩]

হার্টম্যান ও বইসের ভাষায় বাংলাদেশকে "নিশঃব্দ সহিংসতা" দখল করেছে। বাংলাদেশের গ্রামের মানুষ নিশ্চলতার তীব্র সহিংসতার সম্মুখীন হয় যা প্রয়োজনহীন ক্ষুধাকে স্থায়ী করে তোলে।[১৪] এই অপরিবর্তনীয় অবস্থাজাত সহিংসতাকে দু'ভাগে ভাগ করা চলে---কাঠামোগত সহিংসতা এবং কাঠামো বহির্ভূত সহিংসতা।[১৫] কাঠামোগত সহিংসতায় অন্যান্যের মধ্যে রয়েছে অন্যায্য মজুরী, অত্যন্ত উচ্চহারে অর্থলগ্নী, ভাগ চাষের অত্যন্ত অননুকুল শর্ত, মাতব্বরের অত্যাচার, বাধা শ্রমিক, শিশু শ্রমিক, বিনামূল্য সেবা, অস্পৃশ্যতা এবং যৌতুক। দ্বিতীয় ধরনের সহিংসতায় রয়েছে (১) আইনগত সহিংসতা অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় এজেন্ট কর্তৃক আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে শক্তির বৈধ ব্যবহার; (২) রাষ্ট্রীয় এজেন্ট কর্তৃক বেআইনী সহিংসতা; (৩) গ্রামীণ দরিদ্রদের বিরুদ্ধে শক্তিধর ব্যক্তি বা গ্রুপের বেআইনী সহিংসতা; (৪) গ্রামীণ দরিদ্রদের নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য সহিংসতা। সহিংসতার এই আবহ গ্রামীণ এলিটবর্গ তাঁদের নিজেদের স্বার্থে সর্বদা লালন করে। স্থানীয় এলিটবর্গের পক্ষে শুধুমাত্র নিজের শক্তিতে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তাঁরা বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় কাঠামোর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বঞ্চিতদের অধিকার সংরক্ষণে আইনের ছড়াছড়ি থাকা সত্বেও অর্থনীতিতে গ্রামীণ এলিটবর্গ তাঁদের মরণ কামড়কে আরো জোরদার করছে। একে গুনার মিরডাল "নরম রাষ্ট্রের" লক্ষণ বলে চিহ্নিত করেছেন। তার মতে নরম রাষ্ট্র "সব ধরনের সামাজিক বিশৃঙ্খলার সাথে আপোষ করে---যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে আইনের ত্রুটির মধ্যে, বিশেষ করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন স্তরে সরকারী কর্মকর্তাগণের নিকট প্রেরিত আইন এবং নির্দেশের ব্যাপক অমান্যকরণে এবং যে ক্ষমতাধর ব্যক্তি ও গ্রুপের আচরণ তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করা উচিত তাঁদের সাথে এই সরকারী কর্মকর্তাদের সহযোগিতার মাধ্যমে- - - - -। এই বিভিন্ন ধরনের আচরণ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তারা প্রত্যেকে পরস্পরকে বাড়িয়ে তোলে, এমনকি একটি আরেকটির জন্ম দেয়। ফলে তাদের একটি সম্মিলিত চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে।"[১৬]

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক কাঠামোকে প্রায়শঃই কেলেকির ভাষায় "একটি মাধ্যমিক শাসন" বলে চিহ্নিত করা হয়।[১৭] এই মাধ্যমিক শাসনামলের রাজনীতিতে নিম্নমধ্য ও ধনী কৃষকদের আঁতাতের

আধিপত্য বিদ্যমান থাকে। পর্যাপ্ত সম্পদশালী দেশে এই ধরনের জোট একটি স্থিতিশীল সামাজিক পরিস্থিতির জন্ম দেয়। যা হোক, যে সব দেশে উন্নয়নের স্তর খুব নীচু, যেখানে একটি গ্রুপের অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি নিস্ফল প্রচেষ্টায় দাঁড়ায়, সেখানে এই মাধ্যমিক শাসনামলের দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়। অপর্যাপ্ত সম্পদ লাভ করার জন্য কামড়াকামড়ি রাজনৈতিক পদ্ধতিকে অস্থিতিশীল করে তোলে। ফলে জন্মের পর হ'তেই বাংলাদেশে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, ক্যু ও পাল্টা ক্যু সাংবিধানিক পদ্ধতিকে নিষ্ক্রিয় করে তুলেছে। জাতীয় রাজনৈতিক স্থিতিহীনতা স্থানীয় এলিটবর্গের ক্ষমতাকে জোরদার করে তুলেছে।

২। সরকারী উদ্যোগে পল্লী উন্নয়নের জন্য তৃণমূল পর্যায়ের সমবায় প্রতিষ্ঠান

বৃটিশ রাজ দক্ষিণ এশিয়ায় নৈশ প্রহরীর নীতির প্রচলন ঘটিয়ে ছিল। মূলতঃ তাঁরা বিরাজমান অবস্থাকে টিকিয়ে রাখা এবং আইন শৃঙ্খলা প্রশাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উৎসাহী ছিল। বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা ঘটে ষাটের দশকে। আখতার হামিদ খানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে তা' পরিচালিত হয়। সাধারণভাবে "কুমিল্লা মডেল" নামে খ্যাত এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছিল চারটি অংশ ঃ প্রতি থানায় থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র (টিটিডিসি), রাস্তা, খাল/নালা এবং বাঁধ নির্মাণের জন্য পল্লীপূর্ত কর্মসূচী (আর ডব্লিউ পি), থানা সেচ কর্মসূচী (টিআইপি) নামে পরিচিত থানা কেন্দ্রিক ক্ষুদ্র পর্যায়ে সেচ কর্মসূচী এবং থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (টিসিসিএ)-এর অধীনে দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায় পদ্ধতি। এই মডেলের মূল উপাদানগুলোর অধিকাংশের মধ্যে নতুনত্ব কিছু ছিল না। এই মডেলের শক্তি নিহিত রয়েছে নতুন ধ্যান ধারণা এবং দক্ষিণ এশিয়ায় যুগ যুগ ধরে লালিত প্রশাসনিক পদ্ধতির মধ্যে কার্যকর সন্নিবেশনের মধ্যে। সুদূর অতীতে চানক্যের অর্থশাস্ত্রে (খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩য় শতাব্দী) পল্লী পূর্ত কর্মসূচীর আলোচনা খুঁজে পাওয়া যাবে। রাষ্ট্র পরিচালিত কৃষি ঋণ খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীর মহাস্থানগড় শিলালিপির মতই প্রাচীন।[১৯] উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানীতে ক্ষুদে কৃষকদের জন্য যে রেইফেই-সেন সমবায় প্রসার লাভ করেছিল তার দ্বারাও এ মডেল প্রভাবিত হয়েছে।[২০]

জাপানের কৃষি সম্প্রসারণ পদ্ধতি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এই মডেলের মৌলিক বিষয়াদি নিম্নরূপ ঃ

(ক) ঐতিহ্যবাহী ও উন্নয়ন প্রশাসনের সংমিশ্রণ। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী এবং উন্নয়ন প্রশাসনের মধ্যে বিভাজন প্রক্রিয়া কুমিল্লা মডেল প্রত্যাখ্যান করে। যদি ধরেও নেয়া হয় যে, ঐতিহ্যিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রশাসনে সহজাত দুর্বলতা রয়েছে, তবু ধারণা করা যায় যে, একে বাদ দিলে ফল উল্টো হবে।[২১] এর ফলে এই মডেলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রশাসন, স্থানীয় সরকার এবং

উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। স্থানীয় পর্যায়ে সমস্ত এজেন্সীর মধ্যে জোরদার সমন্বয় সাধনার্থে সরকারী সদস্য এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে স্থানীয় সরকারের একটি নতুন স্তর 'থানা কাউন্সিল' সৃষ্টি করা হয়।

(খ) পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সমন্বয় জোরদারকরণ। আখতার হামিদ খান যথার্থই জোর দিয়ে বলেছেন যে,"- - - - - - - - - - পল্লী পূর্ত কর্মসূচী, সেচ কর্মসূচী এবং সমবায়ের মধ্যে সুসম্পর্ক খুব গভীর এবং জরুরী। প্রথমোক্ত দুটি কর্মকাণ্ড জমির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ায় এবং কৃষকের আয় বৃদ্ধি করে। সমবায় তাঁদেরকে মহাজনের খপ্পর হ'তে রক্ষা করে এবং তাদেরকে কৃষি পদ্ধতির আধুনিকায়নে সক্ষম করে - - - -। পূর্ত কর্মসূচী যদি বিঘ্নিত হয় বা সেচ কর্মসূচী যদি দুর্বল হয়ে পড়ে তবে সমবায়েরও পরিসমাপ্তি ঘটে।"[২৩]

(গ) বহুমুখী বহিরাগত পরিবর্তন আনয়নকারী এজেন্ট-এর পরিবর্তে একমুখী অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন আনয়নকারী এজেন্ট। যে সকল গোঁড়া সমাজ উন্নয়ন এবং কৃষি সম্প্রসারণ পদ্ধতি পরিবর্তন আনয়নকারী হিসেবে বাইরে প্রশিক্ষিত লোকজন নিয়োগের সুপারিশ করে কুমিল্লা মডেল তার পক্ষে নয়। এসব বহিরাগতগণ সমাজের সাথে একাত্মতা বোধ করে না। তারা প্রায়শঃই দুর্নীতিপরায়ণ এবং ক্ষুদ্রমনা। আখতার হামিদ খান জোর দিয়ে বলেছেন, "শিক্ষিত লোকজনকে গ্রামে পাঠানোর প্রচেষ্টা অর্থহীন- - - - - - - - -। কার্যতঃ তা'হচ্ছে কোন নদীকে উজানে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা। গ্রামে লক্ষ্যণীয় যে প্রবণতা এবং মনে হয় তা অপরিবর্তনীয় প্রবণতা—তা হচ্ছে সবচে ভালো লোকজন গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। কোন কিছু তাদেরকে নিরস্ত করতে পারে না, তাঁরা যেতেই থাকে।"[২] তাছাড়াও সারথী প্রকল্পগুলোতে যে সামাজিক যোগাযোগের জটাজাল বিদ্যমান তার একটি বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে গ্রামে কোন কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব বা অবিসংবাদিত নেতার অস্তিত্ব নেই। একজন সাধারণ গ্রামবাসী সর্ব বিষয়ে একজন ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করে না বরং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করে। সেজন্যেই পরিবর্তন আনয়নকারী এজেন্ট হিসেবে বহুমুখী কর্মীরা কার্যকর নয়। কুমিল্লা মডেল তাই গ্রামের ভেতর থেকে ছয় ধরনের পরিবর্তন সৃষ্টিকারী এজেন্টকে কাজে লাগিয়েছে ঃ সমবায় সমিতির ম্যানেজার, আদর্শ কৃষক, হিসাব রক্ষক, শিক্ষক, মহিলা সংগঠক এবং দোকানদার।

(ঘ) গ্রামবাসীরা নিজেরাই নিজেদের সমস্যা সমাধানে সক্ষম এই বিশ্বাস। কুমিল্লা মডেলের ধারণাগত ভিত্তি হচ্ছে এই যে, গ্রামবাসীরা খাল কাটা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করার ব্যাপারে নিজেরাই অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ। সরকারী এজেন্সীর মাধ্যমে এ সকল স্কীমের বাস্তবায়ন খরচের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলবে এবং প্রকল্পের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণকে অবহেলিত রাখবে।

(ঙ) প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ। কুমিল্লা মডেলের সাফল্য নির্ভর করে অবিরাম প্রশিক্ষণের উপর। প্রশিক্ষণ এবং সেবাকে সংযুক্ত করার জন্য টিটিডিসি প্রতিষ্ঠা করা হয়। খান দেখিয়েছেন যে, "বৃটিশ আমলে থানা এবং জমিদারের কাঁচারী ছিল সরকার, আইন শৃঙ্খলা এবং রাজস্ব আদায়ের প্রধান প্রতীক। থানা প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়ন কেন্দ্রকে নতুন প্রতীক হিসেবে গঠন করা হয়। গ্রামীণ জনগণের অগ্রগতির জন্য সরকারের নতুন চিন্তাভাবনারই প্রতিফলন টিটিডিসি। সত্যিকারের অংশীদারিত্বের উপর নির্ভরশীল ছিল এই অগ্রগতি। সরকারী বিশেষজ্ঞগণকে এতে জনগণের শিক্ষক এবং প্রশিক্ষক হতে হতো, জনগণের নেতাদেরকে পরিকল্পনা এবং সমন্বয় প্রক্রিয়ায় পুরোপুরি অংশ গ্রহণ করতে হতো। জনগণের সুবিধার্থে সব ধরনের সেবা সরবরাহ এবং বিশেষজ্ঞদেরকে একই ভবনে অবস্থিত হতে হতো।"[২৫]

(চ) বহুমুখী বহুস্তর বিশিষ্ট সমবায় সমিতি হতে একমুখী দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায়ে পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের মূল কারণগুলো দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, ঐতিহ্যিক বহুমুখী সমবায় সমিতিগুলো ১০ থেকে ১৫টি গ্রাম থেকে সদস্য নির্বাচন করতো--- যেখানে দশ থেকে পনেরো হাজার লোক বাস করতো। এরকম সমিতিতে দলীয় সংহতি হতো খুবই দুর্বল। খানের মতে, "সদস্যদের মধ্যেও নামমাত্র সম্পর্ক বিদ্যমান থাকত, তাঁরা বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করতো। কোন সামাজিক সুসংহতি, কোন ঐক্যই পরিলক্ষিত হতো না - - - কোন বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে তা আর সমবায় থাকে না ; একটা কাগুজে প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।"[২৬] দ্বিতীয়তঃ, বহুমুখী সমবায় সমিতি সৃষ্টির বেলায় ধরে নেয়া হয় যে সামাজিক সম্প্রীতি রয়েছে এবং সেখানে বিভিন্ন লক্ষ্যের ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে সহযোগিতা করতে পারে। খানের মতে বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির লক্ষণ হচ্ছে "ঝঞ্ঝাপূর্ণ অর্থনৈতিক লড়াই।"[২৭] খানের বিশ্লেষণ মতে গ্রামের তিনটি প্রধান শ্রেণী-বৃহৎ মালিক, কৃষক মালিক এবং ভূমিহীন শ্রমিক—এদের মধ্যে সুসংহতি বিদ্যমান নেই। ক্ষুদে কৃষক যাঁরা অধিক ফসল ফলানোর ব্যাপারে উৎসাহী তাঁদেরকে একমুখী গ্রামীণ সমবায় সমিতিতে সংগঠিত করা দরকার। যা হোক, বহুস্তর বিশিষ্ট কাঠামোতে যেখানে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত পর্যায়ে অর্থাৎ গ্রাম হতে অনেক দূরের কোন দপ্তরে নেয়া হয় সেখানে ছোট সমবায় বাঁচতে পারে না। সে জন্যেই থানা স্তরে সমষ্টিবদ্ধ দ্বিস্তরবিশিষ্ট সমবায় সংগঠিত করা হয়।

(ছ) বাহির হতে সম্পদ প্রবাহ ঃ যদিও এ মডেলে সম্পদ আহরণের জন্য ক্ষুদে চাষী কর্তৃক স্বল্প সঞ্চয়ের উপর জোর দেয়া হয়েছে তবু এটা স্বীকার করে যে, অবকাঠামো নির্মাণ এবং অন্যান্য সুবিধাদির জন্য স্থানীয়ভাবে সম্পদ যোগাড় করা সম্ভব নয়, উপর থেকে এ সম্পদ প্রদান করতে হবে। খান লিখেছেন, "পল্লী উন্নয়ন পূর্ববর্তী উদ্যোগগুলোর ক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের প্রায় সর্বত্রই বলা হয়েছে, তাঁরা

নিজেরাই নিজেদেরকে সাহায্য করতে পারে। আমরা এই সিদ্ধান্তে পেঁছেছিলাম যে, এটা ছিল ভণ্ডামী এবং ভ্রান্ত উপদেশ। গ্রামবাসীদের জন্য সরকারের অনেক বিনিয়োগ করা প্রয়োজন; সেচ সুবিধা, বিদ্যুতায়ন, যন্ত্রপাতি, একটি ঋণ দান পদ্ধতি ইত্যাদি গড়ে তোলা দরকার যাতে পল্লী এলাকার উন্নয়ন ঘটে।"[২৮]

কুমিল্লা মডেল পল্লী উন্নয়নের জন্য প্রথম তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে। মডেলের তিনটি উপাদান, যথা—টিটিডিসি, আরডব্লিউপি, টিআইপি বাংলাদেশের জন্মের আগেই সারা দেশে প্রসার লাভ করে। দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায়ের পরীক্ষা নিরীক্ষা প্রথমে কুমিল্লা জেলায় করা হয়েছিল এবং জাতীয় ভাবে এটা একটি সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী (আইআরডিপি) হিসেবে সম্প্রসারিত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের (বিআরডিবি) মাধ্যমে এই কর্মসূচীর প্রতিষ্ঠানিক রূপদান করা হয়েছিল। ১৯৮৫ সালের জুন মাসের মধ্যে বিআরডিবি'র ইউসিসিএ-কে,এস,এস (উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি—কৃষি সমবায় সমিতি) দ্বিস্তর বিশিষ্ট কর্মসূচী প্রায় সারা দেশে প্রসার লাভ করে। ৪৪৮টি ইউসিসিএ এবং প্রায় ২·৩ মিলিয়ন সদস্য সমন্বিত ৬২ হাজার কে,এস,এস বর্তমানে চালু আছে।

স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে, সারথী এলাকায় (কুমিল্লা কোতোয়ালী উপজেলা) কুমিল্লা মডেল কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। ১৯৬৩-৬৪ এবং '৭০ এর মাঝামাঝি কুমিল্লা কোতোয়ালী উপজেলায় গড় ধান উৎপাদন বেড়েছে শতকরা ৯৮ ভাগ। এমনকি এই মডেল চালু করার দু'দশক পরেও কুমিল্লা কোতোয়ালী থানায় গড় ধান উৎপাদন ছিল জাতীয় গড়ের চাইতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বেশী। (সারণী ৪ দেখুন)।

সারণী-৪
কুমিল্লা কোতোয়ালী ও বাংলাদেশে ধান উৎপাদনের তুলনামূলক চিত্র (মণে)

বর্ষ	আউশ উৎপাদন		আমন উৎপাদন		বোরো উৎপাদন	
	কুমিল্লা কোতোয়ালী	বাংলাদেশ	কুমিল্লা কোতোয়ালী	বাংলাদেশ	কুমিল্লা কোতোয়ালী	বাংলাদেশ
১৯৭৭-৭৮	১৮·৫০	১০·৮০	২০·৯০	১৪·১৬	২৬·০০	২২·৫০
১৯৭৮-৭৯	১৯·৭০	১১·১৪	২১·৫০	১৪·০৯	২৬·১০	১৯·৮২
১৯৭৯-৮০	১৮·০০	১০·২০	২০·৪০	১৩·৪৬	৩২·৩০	২৩ ২৭
১৯৮০-৮১	২০·৫০	১১·৪৫	২৩·৬০	১৪·২৯	৩০·০০	২৪·৫৭
১৯৮১-৮২	১৯·৫০	১১·২৬	২০·২০	১৩·০০	৩৪·১০	২৬·২৩
১৯৮২-৮৩	১৬·৩০	১০·৫২	১৯·৮০	১৩·৭৫	৩৫·৭০	২৬·৮২

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

কুমিল্লা নিরীক্ষা ললিত পাম্প এবং নলকূপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছে। পূর্ত কর্মসূচীর বাস্তবায়ন ভৌত অবকাঠামো, বিশেষ করে রাস্তা এবং খালের প্রসারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

এই মডেলের সমালোচকগণ অবশ্য অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন যে, এই মডেলের অর্থনৈতিক সুবিধাদি অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। একজন সমালোচক বলেছেন যে, পাইলট এলাকায় কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধি উচ্চ ভর্তুকীর উপকরণের পর্যাপ্ত সরবরাহের জন্য ঘটেছে; "এটা অব্যবহৃত সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে সমবায়ের সহজাত ক্ষমতার" জন্য ঘটেনি।[৩০] সমবায়ের সদস্যগণ অসদস্যদের চাইতে বেশী দক্ষ কিনা এব্যাপারেও মত; বিরোধ রয়েছে। একটি সমীক্ষায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কুমিল্লা কোতোয়ালী থানার সমবায় সদস্যগণ অসদস্যদের চাইতে বেশী ধান উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছিল।[৩১] যা হোক, বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকায় এই অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায়নি।[৩২] অন্য একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে সমবায় মালিকানাধীন গভীর নলকূপ ও অগভীর নলকূপের সেচ এলাকা অসদস্যদের চাইতে বড়। তবে, অসদস্য দল সমবায় দলের চাইতে অধিকতর দক্ষতার সাথে ললিত পাম্প ব্যবহার করেন।[৩৩]

কুমিল্লা মডেলের দুটি প্রধান ত্রুটি রয়েছে। প্রথমতঃ, আরডব্লিউপি এবং বর্ধিত কৃষি উৎপাদনের চুয়ানো সুফল ছাড়া ভূমিহীনদের জন্য এই মডেল কোন সরাসরি সাহায্য প্রদান করেনি। তার ফলে এই মডেলের বাস্তবায়ন পল্লী এলাকায় বৈষম্যকে তীব্রতর করেছে। আখতার হামিদ খান বলেছেন যে, "ভালো পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, রাস্তা এবং সেচ সুবিধা জমির মূল্য এবং ভাড়া উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ভূস্বামীদের অনার্জিত আয় বৃদ্ধি ছিল শ্রমিকদের মজুরীর চাইতে শতগুণ বেশী।"[৩৪]

দ্বিতীয়তঃ, ভূমি মালিকানার বিন্যাসের জাতীয় বৈচিত্র্য কুমিল্লা মডেল বিবেচনায় আনেনি। কুমিল্লাতে ছিল বাংলাদেশের সবচে' কম অনুপাতের ভূমিহীন শ্রমিক, সবচে কম অনুপাতের ভাগচাষী, সবচে' বেশী সংখ্যক মালিক চাষী এবং সবচে' কম অনুপাতের বড় চাষী। ক্ষুদে চাষীদের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল একটি মডেল বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে।[৩৫]

কুমিল্লা মডেলের সম্প্রসারণ অত্যন্ত উচ্চ-হার ভর্তুকি সম্পন্ন উপকরণের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ সুবিধার উপর নির্ভরশীল। কিছু বাছাইকৃত এলাকায় কুমিল্লা মডেলের বাস্তবায়নের জন্য দাতা সংস্থার সাহায্যে তিনটি বৃহৎ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। সেগুলো হচ্ছে (১) আইডিএ অর্থপুষ্ট আরডি-১ প্রকল্প (মোট বিনিয়োগ ৩৭০ মিলিয়ন টাকা, এলাকা ৭টি উপজেলা, ৭ বছরে উপজেলা পিছু ব্যয় ৫৩ মিলিয়ন টাকা)। (২) এডিবি অর্থপুষ্ট সিরাজগঞ্জ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী (মোট বিনিয়োগ ৭২০ মিলিয়ন টাকা ৪টি উপজেলা,

৮ বছরে প্রতিটি উপজেলায় ব্যয় ১৮০ মিলিয়ন টাকা) এবং (৩) ড্যানিডা অর্থপুষ্ট নোয়াখালী সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (মোট বিনিয়োগ ২৪০ মিলিয়ন টাকা, ৩টি উপজেলা, পাঁচ বছরে প্রতিটি উপজেলায় ব্যয় ৮০ মিলিয়ন টাকা)।

আরডি-১ প্রকল্পের একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয় যে, কে,এস,এস সদস্যদের অর্থনৈতিক কৃতি সদস্যদের চাইতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভিন্নতর নয়।[৩৬] সমস্ত এলাকার উন্নয়ন প্রকল্পগুলোই সমন্বয়ের অভাবে বিঘ্নিত হয়েছিল। তাছাড়া, সমন্বিত প্রকল্পগুলোর বিভিন্ন উপাদান একটা যৌক্তিক ক্রমানুসারে বাস্তবায়িত করা যায়নি। উদাহরণস্বরূপ, সেচের জন্য জল সরবরাহের বহু পূর্বেই ঋণ এবং সার বিতরণ করা হয়েছিল। ডেভিড কর্টন যাকে "নীল-নক্সা পদ্ধতি" বলেন, তার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এসব সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-গুলো।[৩৭]

এসব প্রকল্পগুলোকে পরিবর্তনশীল অবস্থা ও অভিজ্ঞতার আলোকে পরিবর্তন করার সুযোগ ছিল না। ইতিমধ্যে সরকার উচ্চাকাঙ্খী সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ না করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং শুধুমাত্র তিনটি উপা-দানের মধ্যে পল্লী উন্নয়নের পরিধিকে সীমিত করেছেন ঃ (১) রাস্তা, গুদাম ও বাজার সহ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ; (২) সেচ সুবিধাপ্রাপ্ত কৃষি কাজ, ক্ষুদ্র পানি নিষ্কাশন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ; (৩) গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য উৎপাদন ও কর্ম-সংস্থান কর্মসূচী।[৩৮]

প্রাথমিক সম্ভাবনা সত্ত্বেও বর্তমানে বাংলাদেশে দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায় তিনটি মৌলিক ব্যাধিতে আক্রান্ত। প্রথমতঃ, যে ইউসিসিএ—কে,এস,এস পদ্ধতি ক্ষুদ্র কৃষকদের সংগঠিত করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল তা' আজ বড় চাষীদের নিয়ন্ত্রণাধীন। বিভিন্ন জায়গায় কে,এস,এস অধঃপতিত হয়ে বড় চাষীদের এক-চেটিয়া প্রতিষ্ঠান হয়ে পড়েছে।[৩৯] ১৯৮০ সালের এক জরিপে দেখা গেছে যে, ইউসিসিএ'র ব্যবস্থাপনা কমিটির কমপক্ষে শতকরা ৪৪ ভাগ সদস্য হচ্ছে বড় কৃষক।[৪০] দ্বিতীয়তঃ, সমবায় সমিতি শৃঙ্খলার (যেমন নিয়মিত যৎসামান্য সঞ্চয়, সাপ্তাহিক হিসাব-নিরীক্ষা) ক্রমোবনতি ঘটেছে। এসব সমিতিতে ঋণ আদায়ের হারও খুব কম। আরডি-১ উপজেলাগুলোতে পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে যে, কে,এস,এস-এর সদস্যদের নিকট প্রায় অর্ধেক ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে পড়েছে।[৪১] পরিশেষে, দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায় টিকে থাকার জন্য পুরোপুরিভাবে সরকারের উপর নির্ভরশীল। গত দু'দশকে সরকারের উদার পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও অধিকাংশ সমিতি অর্থনৈতিক ভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি।

যা হোক, কুমিল্লা মডেলের সহজাত কার্যকারিতার ব্যাপারে মত পার্থক্য রয়েছে। একজন সমালোচক অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, "সমস্ত কর্মকাণ্ডই হচ্ছে বৈষম্যমূলক অবস্থায় সমবায়ের অর্থহীনতার ব্যাপারে একটি শিক্ষা"।[৪২] এ মডেলের প্রণেতাগণের অভিমত হচ্ছে যে, কুমিল্লা মডেলের ব্যর্থতার জন্য এর

সহজাত কোন ত্রুটিকে দায়ী করা চলে না। বস্তুতঃ, মডেলটির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগই গ্রহণ করা হয়নি। অতি দ্রুত সমবায় সমিতিগুলোকে সম্প্রসারিত করা হয়। তাছাড়া, কুমিল্লা মডেলের অন্য তিনটি অবিচ্ছেদ্য উপাদানের সাথে সমবায়কে সমন্বিত করা হয়নি। সেচের জল, পানি নিষ্কাশন, এবং অন্যান্য কাঠামো ছাড়া সমবায় বাঁচতে পারে না। পরিশেষে, দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায়কে সরকারী সহজ ধরনের কর্মসূচীর (যেখানে কম সুদের হারে ঋণ মঞ্জুর করা হয় এবং যেগুলোতে সমবায় শৃঙ্খলার কড়াকড়ি ছিল না) সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে হয়।[৪৩]

বাংলাদেশে ভূমিহীনতা বৃদ্ধির কারণে পল্লী এলাকার চরম দরিদ্রদের কাছে পৌঁছুবার জন্য প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে বৃদ্ধি পায়। ভূমিহীনদের সংগঠিত করার জন্য সরকারী এজেন্সী কর্তৃক তিন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হয় প্রথমতঃ, দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায়ের আওতায় ভিন্ন ভিন্ন ভূমিহীন সমিতি (যথা বিত্তহীন সমবায় সমিতি এবং মহিলা সমবায় সমিতি) সংগঠিত করা হয়। যা হোক, এসব সমিতির সাফল্য খুব নগন্য। আরডি-১ প্রকল্পের মূল্যায়নে দেখা যায় যে, ভূমিহীন সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির এক তৃতীয়াংশ সদস্য এক একরের অধিক জমির মালিক, এমনকি এসব সমিতির শতকরা ১৬ ভাগ পরিচালকের বাৎসরিক আয় ৩০,০০০।- টাকার উর্ধ্বে।[৪৪] কুমিল্লা একাডেমীর প্রকল্প এলাকায় আরেকটি সম্ভাবনাময় নিরীক্ষা পরিচালনা করা হয়। ভূমিহীনদের একটি আলাদা সমিতিতে সংগঠিত করার বদলে বলরাম-পুর ও কাশিনাথপুর গ্রামে সমস্ত শ্রেণীর মানুষজনের সমন্বয়ে সামগ্রিক সমবায় সমিতি গঠন করা হয়। এই সমবায় সমিতিটি লিখিতভাবে "দিদার সমবায় সমিতি" নামে পরিচিত। ১৯৬০ সালে এটা প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ১৯৮২ সালে এর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩ মিলিয়ন টাকা। দিদার সমিতি সকল শ্রেণীর সামাজিক সংহতির ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যা কুমিল্লা মডেলের মৌলিক ধারণার পরিপন্থী। যা হোক, দিদার মডেল অন্যত্র সফলতার সাথে বাস্তবায়িত হয়নি। এই সমিতির অস্বাভাবিক সাফল্যের পেছনে যে সকল কারণ কাজ করেছে বলে মনে করা হয় সেগুলো হচ্ছে—স্থানগত সুবিধা (কুমিল্লার শহরতলীতে অবস্থিত), গ্রামে অকৃষিজীবি বাসিন্দাদের আধিক্য (৫৫০ জন পুরুষ সদস্যের মধ্যে মাত্র ৫০ জন পূর্ণকালীন কৃষিজীবী), কুমিল্লা একাডেমীর উদার পৃষ্ঠপোষকতা এবং এর প্রতিষ্ঠাতার নেতৃত্বের বলিষ্ঠতা।

সরকারী সেক্টরের কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভূমিহীনদের সংগঠিত করার ব্যাপারে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প সবচে' উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা পরিচালনা করেছে। একটা কর্ম গবেষণা কর্মসূচী হিসেবে এর যাত্রা শুরু। এই কর্মসূচীর অনুকল্প ছিল যে, ভূমিহীন লোকজন যাঁরা ঋণের জন্য জামানত প্রদানে অপারগ তাঁদের জন্য স্বাভাবিক ব্যাংক সুবিধাদি প্রদান ঝুঁকিপূর্ণ নয়। গ্রামীণ ব্যাংক (জি,বি)

এই ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠা করা হয় যে, ভূমিহীনদের জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠান দরকার। গ্রামীণ ব্যাংক এবং কুমিল্লা মডেলের মধ্যে দুটো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। প্রথমতঃ গ্রামীণ ব্যাংক সমবায়ের প্রথাসিদ্ধ কাঠামোকে পাশ কাটিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে। আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের জটিলতা অগ্রাহ্য করে এটা গ্রুপ কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করে। দ্বিতীয়তঃ, কুমিল্লা মডেল পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের বিভিন্ন উপাদানের একত্রীকরণ এবং বিরামহীন প্রশিক্ষণের উপর জোর দিয়ে থাকে। গ্রামীণ ব্যাংক শুধুমাত্র ঋণ সরবরাহের উপর জোর দেয়। উদ্দেশ্যের দিক থেকে এই একমুখীতা গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মকাণ্ডকে সহজতর করে তোলে। এসব ভিন্নতা সত্ত্বেও মূলে দ্বিস্তর বিশিষ্ট কুমিল্লা মডেল এবং গ্রামীণ ব্যাংকের পদ্ধতির মধ্যে লক্ষণীয় সাদৃশ্য রয়েছে। দু'টি প্রতিষ্ঠানই সমমনা লোকজনের ছোট ছোট দল সৃষ্টির উপর জোর দেয়। যা হোক, গ্রামীণ ব্যাংক মডেলের প্রতিটি গ্রুপে নিবিড় তত্ত্বাবধানে ৫ জন করে সদস্য থাকে। গ্রামীণ ব্যাংকের পরীক্ষা নিরীক্ষা আরো দেখিয়েছে যে, বড় দলের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং তারা একত্র থাকতে পারে না। একটি গ্রামের সমস্ত গ্রুপ আবার গ্রাম কেন্দ্রে কেন্দ্রীয়ভাবে যুক্ত থাকে। গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যাংক কর্মীরা (বি,ডব্লিউ) গ্রাম কেন্দ্র ও দলসমূহ তত্ত্বাবধান করেন।

এতদ্‌পর্যন্ত জি,বি ঋণ আদায় (৯৬%), গ্রামীণ সঞ্চয় আহরণ (১৯৮৩ সাল পর্যন্ত ১৯·৪ মিলিয়ন টাকা) এবং ব্যবসায়িক দিক থেকে লাভজনক উপায়ে পরিচালনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে। এই কর্মসূচীর মূল্যায়ন থেকে আরো প্রতীয়মান হয় যে, আড়াই বছরে এই ব্যাংকের কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী-দের আয় এই ব্যাংকের কর্মকাণ্ডের ফলে শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ বেড়ে গেছে।[৪৭] প্রত্যাশিত লক্ষ্য দল ভূমিহীন মহিলাদের কাছে পৌঁছুবার ক্ষেত্রেও এই কর্মসূচী সফল হয়েছে।

গ্রামীণ ব্যাংকের এসব চমৎকার সাফল্য সত্ত্বেও মডেলের কিছু সহজাত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের নেয়া ঐতিহ্যিক খামার বহি-র্ভূত কর্মকাণ্ডের (যেমনঃ ছোট ব্যবসা, ঐতিহ্যিক কুটির শিল্প এবং গো-পালন এসব খাতে কৃষি ব্যাংকের শতকরা ৮০ ভাগ ঋণ দেয়া হয়েছে) চাহিদাগত বাধা অতিক্রমের জন্য শুধুমাত্র ঋণদানই যথেষ্ট নয়। এসব কর্মকাণ্ডের অতি আধিক্য অতি সরবরাহের কারণ ঘটাতে পারে এবং ভূমিহীন গ্রামীণ দরিদ্রের আয়ের মাত্রা কমিয়ে দিতে পারে। ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করা গেছে যে, আয় কমে যেতে শুরু করেছে। একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, প্রতিটি ঋণের বৃদ্ধির চাইতে আয় স্বল্পতর হারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।[৪৮]

দ্বিতীয়তঃ গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের নেয়া কর্মকাণ্ডে শ্রমের উৎপাদন-শীলতা খুব কম। উৎপাদনশীল বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতাদের তথ্য, প্রশিক্ষণ, উপকরণ ও সেবা দরকার। বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাংক সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার

বদলে শুধুমাত্র ঋণ কার্যক্রমে ব্যাপৃত। পরিশেষে, এই প্রতিষ্ঠানের বিরামহীন সাফল্যের একটি পূর্বশর্ত হচ্ছে তৃণমূল পর্যায়ে কর্মকাণ্ডের জোর তদারকী। ইতিমধ্যে কিছু প্রতিবেদনদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, সাপ্তাহিক সভায় ঋণ গ্রহীতাদের উপস্থিতি কমে যাচ্ছে।[৪৯] এমত আশংকাও প্রকাশ করা হচ্ছে যে, এর প্রতিভাধর প্রতিষ্ঠাতার অবর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি টিকে নাও থাকতে পারে।

৩। স্থানীয় সরকারের প্রশাসনিক উদ্ভাবন

স্বাধীনতাকালে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রচণ্ড সংকটের সম্মুখীন হয়। স্বাধীনতার জন্য রাজনৈতিক আন্দোলন শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়নি, স্বৈরাচারী শাসনের ঘাঁটি স্থানীয় সরকারের বিরুদ্ধেও পরিচালিত হয়েছিল। নিম্নতম স্তরের স্থানীয় সরকার "নির্বাচনী কলেজ"-এর ভূমিকা পালন করেছিল এবং স্থানীয় সরকার ছিল "বুনিয়াদী গণতন্ত্রের" সমার্থক। এটা ছিল ঔপনিবেশিক সরকারের সাংবিধানিক ভণ্ডামির বাহ্যিক রূপ। ফলে স্থানীয় সরকারগুলো বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর বাতিল করা হয়। ১৯৭৫ সালে জেলা গভর্ণর পরিকল্পনার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনকে পুনর্গঠিত করার একটি উদ্যোগ নেয়া হয়। জেলা প্রশাসন আইনে (১৯৭৫-এর ৪র্থ আইন) এটা বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছিল যে, জেলা গভর্ণর নিযুক্ত হবেন প্রেসিডেন্ট কর্তৃক। সরকারী চাকুরে, সংসদের নির্বাচিত সদস্য বা সরকারী দলের সদস্য হতে গভর্ণর নির্বাচন করা হবে। প্রেসিডেন্ট যতদিন গভর্ণরদের কাজে সন্তুষ্ট থাকবেন ততদিনই মাত্র তাঁরা তাদের পদে থাকবেন। এই আইনের বলে জেলা গভর্ণরগণ কোন জেলা এলাকায় আদালত ব্যতীত সমস্ত দপ্তরের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ ও তদারক করতে পারবেন। এই আইনে অবশ্য তিনটি প্রধান দুর্বলতা ছিল। প্রথমতঃ এই আইন জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কোন অতিরিক্ত ক্ষমতা অর্পন করেনি। তার ফলে, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অটুট থাকে। দ্বিতীয়তঃ জেলা গভর্ণর পদ্ধতি কোন প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান ছিল না। এটা শুধুমাত্র পেশাগত আমলাদের স্থলে রাজনৈতিক আমলাদের অভিষিক্ত করে। পরিশেষে, জেলা গভর্ণর পদ্ধতি ছিল অতিমাত্রায় কেন্দ্রীকৃত একদলীয় রাষ্ট্রের অস্ত্র। নির্বাচিত স্থানীয় সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে এই ধারাটি বাতিল করার জন্য পরবর্তীতে সংবিধানে সংশোধনী আনা হয়।

যা হোক, জেলা গভর্ণর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। একটি ক্যু এর মাধ্যমে একদলীয় শাসনকে উৎখাত করা হয় এবং নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের নিয়ম পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৭৭ সালে স্থানীয় সরকারের নিম্নতম স্তরে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরও স্থানীয় সরকারের স্ববিরোধিতা বিদ্যমান থাকে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮২ এই সময়কালে "স্বনির্ভর গ্রাম সরকার" সংগঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার পেছনে তিনটি প্রধান কারণ লক্ষ্যনীয়। প্রথমতঃ

গ্রাম পর্যায়ে কোন প্রশাসন যন্ত্র ছিল না। সামগ্রিক পল্লী উন্নয়নের জন্য গ্রাম পর্যায়ে একটি প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ স্থানীয় সরকারে শাসক গোষ্ঠীর বিরোধী দলের আধিপত্য বিদ্যমান ছিল। গ্রাম সরকার পরিচালনা করতো কেন্দ্রীয় সরকারের মনোনীত সদস্যরা, স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের তারা তোয়াক্কা করতোনা। পরিশেষে, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে বেকার লোকজনকে কাজে লাগিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারকে একটি কার্যকর হাতিয়ার বলে ধরা হয়েছিল।

গ্রাম সরকারের থাকতো বার জন সদস্য। মহিলা এবং অন্যান্য পেশা-ভিত্তিক বিভিন্ন গ্রুপ—যথা, কৃষক, কারিগর, ভূমিহীন যুবক, এদের যথোচিত প্রতিনিধিত্ব এতে থাকতো। গ্রাম সরকার ছিল পেশাজীবী গ্রুপগুলোর সংঘ। গ্রাম সরকারকে তাদের অর্থনৈতিক অস্ত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল। গ্রাম সরকারকে নির্দেশও দেয়া হয়েছিল গ্রাম পরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য এবং এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নার্থে স্থানীয় সম্পদ এবং উপকরণ চিহ্নিত করার জন্য। কৃষি উপকরণ ও সহায়ক সেবা প্রদান, সেই সাথে গুদামজাতকরণ ও ব্যাংক সুবিধা প্রদানের জন্য ১২০০টি গ্রামীণ উন্নয়ন কেন্দ্রের বিষয় দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় বিবেচিত হয়েছিল। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছিল। ব্যর্থ হবার কারণসমূহ সংক্ষেপে নিম্নোক্ত-রূপে বর্ণনা করা যায় ঃ—

—এটা উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। এটা নিজে থেকেই গড়ে উঠেনি।
—স্থানীয় সরকারের মূল কাঠামোর সাথে এটা সম্পর্কযুক্ত ছিল না।
—গ্রাম সরকার ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল। যেহেতু ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও চেয়ারম্যানগণ গ্রাম সরকারের সদস্য হতে পারতেন না, সেহেতু স্থানীয় সরকারের যে সকল রাজনীতিবিদ পরাজিত হয়েছিল তাঁরাই গ্রাম সরকারে আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

প্রতিষ্ঠানটিতে অতিরিক্ত পরিমাণে রাজনৈতিক মাত্রা যুক্ত করা হয়েছিল। ১৯৮২ সালের প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্গঠন কমিটি মন্তব্য করে যে, "স্বনির্ভর গ্রাম সরকার প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক লক্ষ্যে ব্যবহৃত হয় এবং গ্রাম সরকারের পদাধিকারী ব্যক্তিদের আসীন করার ব্যাপারে শাসক রাজনৈতিক দল অন্যায় হস্তক্ষেপ ঘটায়।"[৫০] একই ভাবে কমিটি অভিযোগ করে যে, "যুব কমপ্লেক্সের মত শক্তিশালী স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হয়। তাঁদের অভূতপূর্ব ক্ষমতা প্রদান করা হয়---যা বিরাজমান প্রতিষ্ঠানগুলো, এমনকি গ্রাম সরকারগুলোকেও অর্থহীন করে তোলে।"[৫১]

নতুন প্রতিষ্ঠানটি শুধু প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই নয় অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও উৎপাদন বিরোধী ছিল। তিনটি সফল গ্রাম

সরকারের অর্থনৈতিক মূল্যায়নে দেখা গেছে যে ঃ

১। প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব এসেছে মূলতঃ বৃহৎ ভূমি মালিকদের মধ্য থেকে। যাঁরা ভূমিহীনদের প্রতিনিধিত্ব করতো তাঁদের অনেকেই ছিল বড় ভূস্বামীদের পুত্র যাঁরা এখনো পৈতৃক সম্পত্তি পায়নি বা স্কুল শিক্ষক এবং ব্যবসায়ী। তাঁদের জমিজমা বিশেষ ছিল না, কিন্তু আর্থিক অবস্থা ছিল মোটামুটি স্বচ্ছল। জরিপ এলাকার গ্রামগুলোতে গড় ভূমি মালিকানা ছিল ১'৫ থেকে ২'৫ একর, অন্যদিকে গ্রাম সরকারের নেতৃবৃন্দের গড় ভূমি মালিকানা ছিল ৮ একর।

২। দু'টি প্রণিধানযোগ্য বিষয়ে এই আন্দোলন ছিল অত্যন্ত দুর্বল ঃ জনগণের অংশগ্রহণের স্তর বিচারে এবং স্থানীয় সম্পদ আহরণের কার্যকারিতার বিচারে। আন্দোলনটি বহুল পরিমানে নির্ভরশীল ছিল সরকারী সাহায্য ও উদ্যোগের উপর।

৩। পল্লী এলাকায় স্বনির্ভর প্রকল্প অর্থনৈতিক বৈষম্যকে ত্বরান্বিত করে। এসব প্রকল্পগুলো ছিল শ্রমনির্ভর। প্রকল্পগুলোতে যাঁরা শ্রম দিত তাঁরা ছিল মূলতঃ ভূমিহীন। তাঁরা এসব রাস্তা, খাল এবং জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা থেকে লাভবান হয় না। বড় জোর স্বনির্ভর প্রকল্প (সেচ, জল নিষ্কাশন, রাস্তা ইত্যাদি) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি বা কৃষিজাত দ্রব্যাদির বাজারজাতকরণে সহায়ক হয়। এসব প্রকল্পের সুফল ভূমি মালিকানার ভিত্তিতে বর্তায়। পুনর্বণ্টন পদ্ধতির অভাবে স্বনির্ভর প্রকল্পের বিষয়ে দরিদ্রের উৎসাহ উদ্দীপনাকে ধরে রাখা যায়নি।

স্থানীয় সরকারের বিকল্প ব্যবস্থা সৃষ্টির পরীক্ষা নিরীক্ষা একের পর এক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৯৮২ সালে সরকার প্রশাসনিক পুনর্গঠন ও সংস্কার কমিটি নিয়োগ করে। কমিটি স্থানীয় সরকারকে জোরদার করার জন্য জোর সুপারিশ রাখে। এই কমিটির মতে "স্থানীয় সরকারগুলোকে সত্যিকারভাবে স্বনির্ভর প্রাণবান প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং পারস্পরিক ও পরিপূরক উন্নয়নের জন্য তাঁদের মধ্যে যথার্থ সমান্তরাল ও উল্লম্ব যোগাযোগই হবে মূল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঐতিহাসিকভাবে দেখা গেছে যে, পুঁজিবাদী বা সমাজবাদী বা সমাজতান্ত্রিক যে কোন সমাজেই পল্লী এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সরকার অন্যতম মুখ্য ভূমিকা পালন করে। তথ্যগত প্রমাণ রয়েছে যে, যে সব দেশ স্থানীয় সরকারের ব্যবহার ঘটায়নি তাদের চাইতে যারা পরিকল্পনা এবং উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সরকারের ব্যবহার ঘটিয়েছে তারা উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মাথাপিছু আয় লাভে সক্ষম হয়েছে এবং প্রথমোক্ত দেশগুলো এখনো স্থবির পর্যায়ে থেকে গেছে।"[৫৩] এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী যে উপজেলা পদ্ধতির সূচনা করা হয় তা' মূলতঃ কুমিল্লা মডেলের একটি সম্প্রসারণ। থানাই হওয়া উচিত সমস্ত প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের মূলকেন্দ্র, এ ধারণার উপরই গড়ে উঠে উপজেলা পদ্ধতি। কুমিল্লা মডেলের মৌলিক তত্ত্বই ছিল তাই। পরবর্তী অনেক গবেষণাতেও থানা পর্যায়ে সমন্বয়ের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।[৫৪] কুমিল্লা মডেলে এটাও ধরে নেয়া হয় যে, শুধুমাত্র স্থানীয় সম্পদ আহরণের

মাধ্যমে গ্রামীণ সমস্যা সমাধান করা যাবেনা এবং কেন্দ্র থেকে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান-গুলোতে পর্যাপ্ত সম্পদের প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে। যা হোক, কুমিল্লা মডেলের থানা কাউন্সিল থেকে উপজেলা পরিষদের চারটি পার্থক্য রয়েছে ঃ (ক) থানা কাউন্সিলের প্রধান ছিলেন একজন সরকারী কর্মকর্তা (এসডিও), অন্যদিকে উপজেলা পরিষদের রয়েছে সরাসরি নির্বাচিত চেয়ারম্যান। (খ) থানা কাউন্সিলের রাজস্ব আদায়ের কোন ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু উপজেলা পরিষদকে করারোপের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। (গ) পৌরসভার (মিউনিসিপ্যালিটি) উপর থানা কাউন্সিলের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসন পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ, ১৯৮২-এর ২৫ নং ধারা বলে উপজেলা পরিষদকে তার এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় সমস্ত ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। (ঘ) উপজেলা পরিষদের গঠনও থানা কাউন্সিল হতে ভিন্নতর। উপজেলা পরিষদে রয়েছে একজন সরাসরি নির্বাচিত চেয়ারম্যান, উপজেলাস্থ সকল ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার চেয়ারম্যান, তিনজন মনোনীত মহিলা সদস্য, সরকার মনোনীত সরকারী কর্মকর্তা, একজন মনোনীত সদস্য এবং ইউসিসিএ'র চেয়ারম্যান এর সদস্য। সরকারী সদস্যদেরকে ভোট প্রদানের ক্ষমতা দেয়া হয়নি।

এই নতুন পদ্ধতির মধ্যে পরিসংক্রমের কিছু উপাদানও রয়েছে। উপজেলা পরিষদকে করারোপ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, সুস্পষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করে একে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। একটি সরকারী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে জাতীয় সরকার ও উপজেলা পরিষদের দায়িত্ব সমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে সরকার যে সব কার্যাবলী সম্পন্ন করতেন তাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয় ঃ হস্তান্তরিত কার্যাবলী ও সংরক্ষিত কার্যাবলী। জাতীয় সরকারের কার্যাবলী ১৭টি বিষয়ের বিশদ তালিকার মধ্যে সীমিত রাখা হয়, যার মধ্যে রয়েছে ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচার, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, অত্যাবশ্যকীয় সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখা, বড় বড় স্কীম, খাল খনন, খনিজ সম্পদের উন্নয়ন। ধরে নেয়া হয় যে, সরকার যে সব বিষয়াদি সংরক্ষণ করেননি তা উপজেলা পরিষদের আওতাধীন। যদিও সরকারীভাবে দাবী করা হয় যে, পরিসংক্রম হচ্ছে বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্য, তবু উপজেলা পরিষদ সরকারের একটি অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান হিসেবেই বিদ্যমান। স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসন পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ ১৯৮২-এর ২৬ নং ধারা বলে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত যে কোন ইনস্টিটিউশন বা এর ব্যবস্থাপনার আওতাধীন যে কোন সেবামূলক কার্যক্রমকে সরকার গ্রহণ করতে পারে বা তার উল্টোটিও করার ক্ষমতা রাখে। উপজেলা পরিষদকে নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা করার প্রভূত ক্ষমতা সরকারের রয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—সদস্য মনোনয়নের ক্ষমতা, বাজেট অনুমোদন, কর অনুমোদন, সাধারণ তদারকী ও নিয়ন্ত্রণ, কোন কার্যবিবরণী

রদ বা পরিষদের কোন প্রস্তাবের বাস্তবায়ন স্থগিতকরণ এবং নির্বাচিত পরিষদ বাতিলকরণ। এতদ্‌পর্যন্ত উপজেলা পরিষদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে খুব বেশী পরিমাণ অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ করা থেকে সরকার মোটামুটিভাবে বিরত থেকেছে। যা হোক, সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত প্রভূত ক্ষমতা উপজেলা পরিষদের উপর ডেমোক্লেসের খড়্গের মত ঝুলছে। উপজেলা পরিষদের দুর্বলতম বিষয় হচ্ছে অর্থনৈতিক কাঠামো। যদিও পরিষদকে ট্যাক্স এবং লেভি সংগ্রহ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে তবু উপজেলা পরিষদের জন্য নির্ধারিত রাজস্বের উৎস সম্ভাবনার দিক থেকে উল্লেখযোগ্য নয়।[৫৫] এ আয় দৈনন্দিন কার্যপরিচালনার খরচের জন্যও যথেষ্ট নয়। তার ফলে উপজেলা পরিষদ তার অস্তিত্বের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অতি পরিমাণে নির্ভরশীল। এটাই তাদের রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনকে নিষ্ক্রিয় করে তুলেছে। জাতীয় সরকার এবং উপজেলা পরিষদের মধ্যে রাজস্ব ভাগাভাগির কোন সাংবিধানিক ব্যবস্থা নেই। সত্যিকার অর্থে উপজেলা পরিষদ কেন্দ্রীয় সরকারের অংশীদার নয়, অর্থনৈতিকভাবে এবং আইন-গতভাবে তার ক্রীড়নক মাত্র।

যা হোক উপজেলা পরিষদের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নের সময় এখনো আসেনি। চিমা এবং রণ্ডিনেলী যথার্থই নির্দেশ করেছেন যে, "বিকেন্দ্রীকরণের সুফল পেতে হলে তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন।"[৫৬] এমনকি এই সংক্ষিপ্ত সময়েও উপজেলা পরিষদের নিম্নলিখিত সাফল্যগুলো সহজেই চিহ্নিত করা যায় ঃ

(ক) পল্লী এলাকায় সরকারী ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জাতীয় সরকার ভৌত অবকাঠামোর জন্য ৫২৫৩ মিলিয়ন টাকা ব্যয় করেছে। উন্নয়ন কাজের জন্য গ্র্যান্ট-ইন-এইড হিসেবে ৩৭০৯ মিলিয়ন টাকা এবং ৩৫০৮ মিলিয়ন টাকা মূল্যের ৮·৪৫ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য প্রদান করেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ দুই বৎসরে উপজেলা পরিষদকে পাবলিক সেক্টরে বরাদ্দের শতকরা প্রায় ৬·৭ ভাগ প্রদান করা হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৮৫-১৯৯০) পাবলিক সেক্টরের পরিকল্পিত বরাদ্দের (টাকা ২২৫০০ মিলিয়ন) শতকরা ৯ ভাগ উপজেলার উন্নয়ন সাহায্য এবং অবকাঠামোর জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে।

(খ) উপজেলায় একটি নতুন প্রশাসনিক কাঠামো স্থাপন করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে। হস্তান্তরিত বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত জাতীয় কর্মকর্তাদের চাকুরী প্রেষণে উপজেলা পরিষদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

(গ) স্থানীয় পর্যায়ে কর্মকর্তাদের নিকট উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। বিশেষতঃ বিচার ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকৃত করা হয়েছে এবং দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

উপজেলা পদ্ধতির অবশ্য কিছু কিছু সহজাত ঝুঁকি ও দুর্বলতা রয়েছে। এদের কোন কোনটা সাময়িক সমস্যা, অন্যান্যগুলো কাঠামোগত ত্রুটি। প্রথমতঃ একটি উপজেলা পরিষদের এলাকায় গড় জনসংখ্যা হচ্ছে ০·২ মিলিয়নের অধিক। পল্লীর দারিদ্রের কার্যকর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে উপজেলা খুবই বিপুলায়তন প্রতিষ্ঠান। উন্নয়নশীল দেশসমূহের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, স্থানীয় সরকারগুলোতে সাধারণতঃ আধিপত্য করে গ্রামীণ এলিটবর্গ।

"পূর্বকালে এ ধরনের গ্রামীণ এলিটবর্গকে প্রায়শঃই সমাজসেবী হিসেবে দেখা যেতো, বর্তমানে অধিকাংশ সময় তাদেরকে শোষক হিসেবে দেখা হয়।"[৫৭] ১৯৭৮ সালে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের এক জরিপে দেখা গেছে যে, ইউনিয়ন পরিষদের শতকরা ৬০ ভাগ নেতৃবৃন্দ ৭·৫ একরের চাইতে বেশী জমির মালিক, যেখানে শতকরা ৭০ ভাগ কৃষক ২·৫ একরের কম জমির মালিক। তদন্তে আরো দেখা গেছে যে, পরিষদের পদে আসীন হবার পর তাদের অর্ধেক সদস্য অতিরিক্ত জমির মালিক হয়েছে।[৫৮] সুতরাং এটা ধরে নেয়া যায় যে, স্থানীয় সরকারকে জোরদার করলে গ্রামীণ এলিটবর্গের শোষণ করার ক্ষমতা বাড়বে বই কমবে না।

দ্বিতীয়তঃ উপজেলা পরিষদ গৃহীত অধিকাংশ প্রকল্প পল্লী এলাকায় বৈষম্যকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। উপজেলা পরিষদের পুরো বরাদ্দের শতকরা ৭০ ভাগ ব্যয় হয় ভৌত সুবিধা, বিজ্ঞান, কৃষি, সেচ, পরিবহন ও যোগাযোগ প্রকল্পে। এসব প্রকল্প গ্রামীণ দরিদ্রদেরকে সরাসরি লাভবান করবে বলে মনে হয় না। বাংলাদেশে আইয়ুব আমলে (১৯৫৮-৬৯) একই ধরনের প্রকল্পের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, উদ্বৃত্ত উৎপাদনকারী চাষীদের ছোট্ট দল এসব প্রকল্পের সুফল লুটে নেয়।[৫৯] তৃতীয়তঃ উপজেলা পরিষদ হচ্ছে ঝঞ্ঝাসংকুল আমলাতান্ত্রিক সমুদ্রে একটি গণতন্ত্রের দ্বীপ। উপজেলা এবং পরবর্তী উচ্চতর জেলার মধ্যকার সম্পর্ক এখনো নির্ধারিত হয়নি। উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া বিভিন্ন অবাস্তব আইন-কানুন প্রয়োগের মাধ্যমে উপজেলাকে পঙ্গু করে দেয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, অর্থ বরাদ্দের বিরাজমান নিয়ম উপজেলার অর্থনৈতিক সম্ভাবনার ভিন্নতাকে বিবেচনায়ই আনেনা।[৬০] চতুর্থতঃ উপজেলা পরিষদ হচ্ছে একটি বিভক্ত শিবির। এর পরতে পরতে দ্বন্দ্ব—আমলা ও রাজনীতিবিদের দ্বন্দ্ব, আমলাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং রাজনীতিবিদদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব।[৬১] উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন এক সাথে অনুষ্ঠিত হয়নি। ফলে উপজেলা পরিষদে সরাসরি নির্বাচিত চেয়ারম্যানদের প্রতি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের কোন আনুগত্যের দায় নেই। আমলাগণ রাজনীতিবিদদের বিশ্বাস করে না, রাজনীতিবিদরাও উল্টো আমলাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মনোভাব গড়ে তোলে। উপজেলা পর্যায়ে আমলাগণও দায়িত্বগত ও এলাকাগত বিরোধ, সাধারণ প্রশাসক ও বিশেষজ্ঞ বিরোধ এবং ক্যাডারে ক্যাডারে প্রতিদ্বন্দ্বিতার শিকার হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফলে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, ১৯৮৪ অর্থ বছরে

উপজেলা পরিষদসমূহ ছাড়কৃত অর্থের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগও ব্যয় করতে পারেনি।

উপজেলা পরিষদকে প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউশন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য দীর্ঘ মেয়াদী প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর রাজনৈতিক ভাবে টিকে থাকার ক্ষেত্রে সবচে' বড় বাধাকে বি সি স্মিথ "রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব" বলে অভিহিত করেছেন।[৬২] এসব ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন কেন্দ্রের শাসক দলের ক্রীড়নকে পরিণত হয়। ফলে জাতীয় পর্যায়ে যখন ক্ষমতার হাত বদল হয় তখন বৈধতার সংকট দেখা দেয়। বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপারে সঠিক জাতীয় মতৈক্য থাকা সত্ত্বেও এ ধরনের দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা কোন ক্রমেই উড়িয়ে দেয়া যায় না। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের নির্বাচনের সময়কাল ও পদ্ধতি নিয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। এখনো নিশ্চিত নয়, প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল কর্তৃক উপজেলা নির্বাচন বর্জন কোন বৈধতার সংকটের জন্ম দেবে কিনা; সেক্ষেত্রে এই নতুন প্রতিষ্ঠানটি বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। স্বল্পকালীন সুবিধার জন্য উপজেলা পরিষদকে ব্যবহার করা উচিত নয়। বিকেন্দ্রীকরণের পরিকল্পনা দীর্ঘ মেয়াদের ভিত্তিতে গ্রহণ করা উচিত। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে বাংলাদেশে বিকেন্দ্রীকরণের সরকারী কর্মসূচী ছিল স্থায়ীত্বহীন। যথেষ্ট সময় এবং দিক নির্দেশনার নিরবচ্ছিন্নতা ছাড়া বিকেন্দ্রীকরণের কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে যথোপযুক্ত সুযোগ দেয়া সম্ভব নয়।

৪। বাংলাদেশের এন,জি,ও কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষা-নিরীক্ষাসমূহ

সরকারী এজেন্সী কর্তৃক পল্লী উন্নয়ন ও বিকেন্দ্রীকরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাশাপাশি গত দু'দশকে বাংলাদেশে গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (এন,জি,ও) কর্তৃক পরিচালিত বেশ কিছু সংখ্যক উদ্ভাবনী কর্মসূচী লক্ষ্য করা গেছে। বিভিন্ন দেশে ঐতিহাসিকভাবে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সর্বদাই গ্রামীণ দরিদ্রদের মধ্যে একটি কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে এন,জি,ওদের সংখ্যার ত্বরিত বৃদ্ধি ঘটে। বর্তমানে সরকারের নিকট রেজিস্ট্রীকৃত ৮,০০০ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এদের অধিকাংশ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান। প্রায় ২০০ শত প্রতিষ্ঠান বিদেশী উৎস থেকে সাহায্য পায়। বাংলাদেশে সাম্প্রতিকালে এন, জি, ও কর্মকাণ্ডের ব্যাপ্তির বেশ কিছু কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ শিল্পোন্নত দেশের এন,জি,ওগুলোর আয় যথেষ্ট। ১৯৮৩ সালে তারা প্রায় ৩·৬ বিলিয়ন ডলার রেয়াতী সাহায্য দিয়েছে যা প্রায় শিল্পোন্নত দেশের মোট প্রদত্ত সাহায্যের শতকরা ১০ ভাগ।[৬৩] এন,জি,ওদের তহবিলের প্রায় তিনের দু'ভাগ আসে ব্যক্তিমালিকানাধীন খাত থেকে এবং বাকীটা আসে সরকারী খাত হতে। অফিসিয়াল ডেভেলপম্যান্ট এ্যাসিস্টেন্স (ও,ডি,এ)-এর প্রায় শতকরা চার ভাগ দেয়া হয়েছে এন,জি,ওদের মাধ্যমে। ১৯৮৪-৮৫ সালে শুধুমাত্র বাংলাদেশই এন,জি,ওদের মাধ্যমে পেয়েছে প্রায় ৮০·৪ মিলিয়ন ডলার। দ্বিতীয়তঃ বাংলা-

দেশে দারিদ্রের ব্যাপকতা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে সৃষ্ট ধ্বংসযজ্ঞ বিরাট সংখ্যক এন,জি,ওকে বাংলাদেশে আকৃষ্ট করে।

বাংলাদেশের এন,জি,ওগুলোকে ৫টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ দাতা সংস্থা—যারা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক এন,জি,ওকে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের জন্য তহবিল দিয়ে থাকে। এসব সংস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, অক্সফাম, নভিব, কিউসো ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ আন্তর্জাতিক এন,জি,ও—যারা বাংলাদেশের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে সরাসরি অংশগ্রহণ করে। কেয়ার, এস,ই,এফ, আর, ডি,আর, এস, হীড, এম,সি,সি ইত্যাদি এই ভাগে পড়ে। তৃতীয়তঃ দেশীয় এন, জি,ও-যারা বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম সংগঠিত করছে। প্রধান প্রধান দেশীয় এন,জি,ওগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ গ্রামীণ উন্নয়ন কমিটি (ব্র্যাক), গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র (জি,কে), প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, প্রশিকা কুমিল্লা, নিজেরা করি, কারিটাস ইত্যাদি। চতুর্থতঃ বেশ কিছু সংখ্যক স্থানীয় কর্মকাণ্ডের এন,জি,ও রয়েছে যারা স্বল্প এলাকায় তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। পরিশেষে, কতগুলো সেবামূলক এন,জি,ও রয়েছে যারা অন্যান্য এন,জি,ওকে কারিগরী সহায়তা ও সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে। বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান সমিতি (এডাব), স্বেচ্ছামূলক স্বাস্থ্য সেবা সমিতি (ভিএইচএসএস) ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন সমিতি সমূহ (মাইডাস) এই ভাগে উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশে দেশীয় এন,জি,ওগুলোর মধ্যে ব্র্যাক সবচে' বেশী পরিচিত। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে শরণার্থীদের সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে একটি উদ্যোগ হিসেবে ১৯৭২ সালে ব্র্যাক সাহায্য বিতরণী প্রতিষ্ঠানরূপে কাজ শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটির উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

(ক) ব্র্যাকের কর্মপদ্ধতির পেছনে যে চিন্তা-চেতনা কাজ করে তা হচ্ছে, গ্রামীণ দরিদ্ররা কখনোই তাঁদের অবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে পারবে না যদি না তাঁরা গ্রামীণ এলিটবর্গকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য ভারসাম্য আনয়নকারী ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। সেজন্যে ব্র্যাক ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদেরকে শক্তিশালী গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য উৎসাহ প্রদান করে। ব্র্যাকের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে, ভূমি মালিক ও ভূমিহীনদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্বের জন্য সমস্ত গ্রামবাসীকে একই প্রতিষ্ঠানে সংগঠিত করা অর্থহীন। ব্র্যাকের গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান (ভিও) ভূমিহীনদের কয়েকটি কমিটি কর্তৃক পরিচালিত হয়, যারা পরস্পরকে নিয়ন্ত্রণ করে।

(খ) ব্র্যাক বিশ্বাস করে যে, চেতনার উন্নয়ন ব্যতীত ভূমিহীনদের কার্যকর উন্নয়ন সম্ভব নয়। সেজন্যে সচেতনায়নের উপর জোর দেয়।[৬৫] অক্ষর জ্ঞান প্রদানের জন্য এবং সেই সাথে ভূমিহীনদের মধ্যে দারিদ্রের উৎস এবং সংঘবদ্ধ কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সাধারণ সচেতনতা সৃষ্টির জন্য তারা একটি ব্যবহারিক শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করে। ব্র্যাক তার সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যও প্রশিক্ষণ প্রদান করে যা গ্রামীণ ব্যাংক করে না।

(গ) ব্র্যাক তার কার্যক্রম কোন পূর্ব পরিকল্পনা নিয়ে শুরু করেনি। শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্র্যাকের কার্যক্রম রূপলাভ করেছে। বর্তমানে ব্র্যাক তিন ধরনের কর্মসূচী পরিচালনা করেঃ সচেতনায়নের জন্য আউটরিচ কর্মসূচী, গ্রামীণ ঋণ ও প্রশিক্ষণ প্রকল্প এবং কিছু কিছু নির্বাচিত এলাকার জন্য সমন্বিত কর্মসূচী। এসব প্রকল্পের অভিজ্ঞতা থেকে কার্যকর ভূমিহীন দল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্র্যাকের কৌশলকে তিনটি পর্যায়ে চিহ্নিত করা যায়।[৬৬] প্রথম পর্যায়ে সমস্ত নতুন দল দু'বছর পর্যন্ত সচেতনায়নের প্রশিক্ষণ পায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক ভিত তৈরীতে সাহায্য করার জন্য দলকে দু'থেকে পাঁচ বছর কাল ঋণ ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। শেষ পর্যায়ে থাকে স্বাস্থ্য শিক্ষাসহ ৬-৭ বছরের সমন্বিত কর্মসূচী। এ পর্যায়ে ব্র্যাকের উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের সামর্থ এবং সাংগঠনিক দক্ষতা সৃষ্টির জন্য সাহায্য সহযোগিতা এবং সেবা প্রদান। ধরে নেয়া হয় যে, একটি সমন্বিত প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের পর দরিদ্রগণ নিজেরাই নিজেদের সাহায্য করতে পারবে এবং ব্র্যাকের লোকজন সেখান থেকে তাদের কর্মকাণ্ড গুটিয়ে ফেলতে পারবে।

(ঘ) ব্র্যাক ঋণের ব্যাপারেও কড়াকড়ি নিয়ম শৃংখলা বজায় রাখার উপর জোর দেয়। যে সব দল ঋণ পায় তাদের উপর নিম্নবর্ণিত কঠোর শর্ত আরোপ করা হয়ঃ দলের সদস্যদের নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক সভায় যোগ-দান বাধ্যতামূলক এবং তাঁদেরকে একটি সঞ্চয় তহবিলে কমপক্ষে এক টাকা জমা দিতে হয়। সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের ব্যবহারিক শিক্ষা কোর্সে অংশ গ্রহণ করতে হয়। যৌথ সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার ব্যাপারে দলকে সক্ষম-তার প্রমাণ দিতে হয় এবং প্রয়োজনীয় ঋণের শতকরা দশভাগ দলের লোকদের নিজেদেরকেই জোগাড় করতে হয়। গ্রামীণ ব্যাংক বিশ্বাস করে যে, গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য ছোট ছোট দল আবশ্যক; ব্র্যাক তা করে না। সাধারণতঃ একটি গ্রামে দু'টো দল থাকে, পুরুষদের জন্য একটা আর মহিলাদের জন্য আরেকটা। ব্র্যাক দলীয় সদস্যদের যৌথ কর্মকাণ্ডের উপরও জোর দিয়ে থাকে।

(ঙ) প্যারামেডিকদের সাহায্যে ব্র্যাক নতুন স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সূচনা করেছে। প্যারামেডিকগণ ১৮ থেকে ২০ ধরনের সাধারণ রোগের চিকিৎসা করে, টিকা দেয় এবং গ্রামবাসীদের পরিবার পরিকল্পনা ও প্রতিষেধক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য দু'ধরনের। প্রথমতঃ এটা গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য উন্নততর স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে। দ্বিতীয়তঃ এটা ব্র্যাকের প্যারামেডিকদের খণ্ডকালীন কর্মের সংস্থান করে।

কিছু কিছু এলাকায় (১৫০০ গ্রামের ৮০,০০০ হাজার সদস্যের ১৭০০ গ্রুপ) গ্রামীণ দরিদ্রদেরকে সংগঠিত করার ব্যাপারে সফল হলেও ব্র্যাকের দু'টি প্রধান সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রথমতঃ ব্র্যাক তার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য

বাইরের সাহায্য-সহায়তার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। দ্বিতীয়তঃ ব্র্যাকের কর্ম-পদ্ধতি খুবই দীর্ঘ মেয়াদী এবং এর সম্প্রসারণ অত্যন্ত ব্যয় বহুল।

ব্র্যাকের সচেতনায়ন কর্মসূচী অন্যান্য জাতীয় কার্যক্রমের এন,জি,ও কর্তৃক উন্নততর করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রশিকা নামে অন্য একটি এন,জি,ও "মানবিক উন্নয়ন"-এর উপর জোর দিয়ে থাকে; তাদের কার্যক্রম দরিদ্র ও অত্যাচারিতদেরকে বিরাজমান সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে আস্তে আস্তে সচেতন করে তোলে। প্রশিকা জনপ্রিয় থিয়েটারের একটি বিশেষ কর্মসূচীও চালু করেছে যা সাধারণতঃ অংশগ্রহণকারীদের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে কোন বিষয় বা ঘটনাকে চিহ্নিত করে। বাংলাদেশে অংশগ্রহণমূলক কর্ম গবেষণায়ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে এন,জি,ওগুলো।[৬৭] এন,জি,ওগুলোর প্রধান প্রধান অবদানকে সংক্ষেপে এভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে ঃ

—এন,জি,ওদের লক্ষ্যদল কেন্দ্রিক কর্মপন্থা সমরূপ সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থাসম্পন্ন দরিদ্রদের ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদনমুখী ইউনিটে সংগঠিত করার ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করেছে। এসব দল রাজনৈতিকভাবে সচেতন। বিরাজমান গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর দ্বারা সহজে তাঁদেরকে বিভ্রান্ত করা যাবে না।

—বাংলাদেশে এন,জি,ওরা দেখিয়েছে যে, বাংলাদেশের দরিদ্ররা ঋণ পাবার যোগ্য। দরিদ্রদের ঋণ পরিশোধের হার খুব উঁচু এবং তারা ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে বাজার প্রচলিত হারেই সম্মত থাকে। এর ফলে দরিদ্রদের জন্য ব্যাংক সুবিধা প্রদান একটি বাস্তবধর্মী প্রস্তাব হয়ে উঠেছে। সফল এন,জি,ওগুলো দেখিয়েছে যে, দরিদ্ররা সঞ্চয়ও করতে পারে। যা হোক, গ্রামীণ দরিদ্রদের ক্ষেত্রে আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য দলীয় চাপ প্রয়োজনীয় বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

—এন,জি,ওরা দেখিয়েছে গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য ঋণ সরবরাহ ও প্রশিক্ষণই যথেষ্ট নয়। যেটার বেশী প্রয়োজন তা হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। দরিদ্ররা নিজেদেরকে যে দৃষ্টিতে দেখে এবং বিশ্ব সম্পর্কে তারা যে ধারণা পোষণ করে তার পরিবর্তন দরকার। আশাহত দরিদ্রদেরকে এই ধারণা দেয়া উচিত যে, পৃথিবীটা অন্য রকম হতে পারে এবং বিকল্প পথও রয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়াকে সচেতনায়ন বা চেতনার উন্নয়ন বলা হয়। বাংলাদেশে এন,জি,ওগুলো সচেতনায়নের সম্ভাবনাকে মূর্ত করেছে।

—বাংলাদেশের কিছু কিছু এন,জি,ও গ্রামীণ দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য জনপ্রিয় লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ঘটিয়েছে। আর,ডি,আর,এস-এর তৈরী পা-চালিত পাম্প এম,সি,সি-র তৈরী শক্তিচালিত পাম্প এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

—স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এন,জি,ওগুলো লাগসই মডেল সৃষ্টিতেও সাফল্য অর্জন করেছে। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মকাণ্ড এবং ব্র্যাকের ওরাল ডিহাইড্রেশন থেরাপীর অংশ ওরাল থেরাপী সম্প্রসারণ কর্মসূচী বিশেষ সমাদর লাভ করেছে।

—এন,জি,ওরা সরকারী এজেন্সী হতে অধিকতর উদ্ভাবনী সম্ভাবনাসম্পন্ন। এন,জি,ওরা কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে অধিকতর নমনীয়। সরকারী এজেন্সীর এই সুবিধাটি নেই। তাদেরকে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পূর্ব পরিকল্পিত পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয় না। "ঐতিহ্যিক প্রকল্প হচ্ছে কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত এবং কাঠামোকেন্দ্রিক; অপরদিকে এন,জি,ও কর্মসূচীগুলো অধিকতর হারে স্থানীয়ভাবে পরিকল্পিত এবং কার্যকালে পরিবর্তনযোগ্য।"৬৮ ফলে সরকারী এজেন্সী কর্তৃক অন্যত্র বাস্তবায়নযোগ্য ক্ষুদ্র পাইলট সরবরাহ পদ্ধতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে এন,জি,ওরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

—পল্লী উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ সৃষ্টিতে এন,জি,ওরা সহায়তা প্রদান করতে পারে। কিছু কিছু এন,জি,ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে গ্রামীণ দরিদ্রদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সফল হয়েছে।

—এন,জি,ওদের প্রচারস্বল্পতা তাঁদেরকে রাজনৈতিক লড়াই ও আইনগত সংকট থেকে মুক্ত রাখে; প্রায়শঃই এই বাধাসমূহ সরকারী কর্মসূচীকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়।

এন,জি,ওদের অবশ্য কতগুলো সহজাত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রথমতঃ প্রায় সব এন,জি,ওই বহির্দেশীয় সাহায্যের উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এন,জি,ওদের লাগামহীন কর্মতৎপরতা একটি দেশের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের জন্য প্রচণ্ড হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এন,জি ওরা অনেক ক্ষেত্রেই সরকারী কর্মকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি করে। ফলে এন,জি,ও ও সরকারের মধ্যে বিপজ্জনক প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হতে পারে। তৃতীয়তঃ প্রায়শঃই এন,জি,ওরা সরকারী কর্মসূচীর কার্যকারিতা বিনষ্ট করে এবং তাকে ধ্বংস করে। উচ্চতর বেতন ভাতা ও অধিকতর সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে এন,জি,ওগুলো অধিকতর দক্ষ মানুষজনকে আকৃষ্ট করে। সরকারী কর্মচারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপর্যাপ্ত বেতন পায় এবং ফলে এন,জি,ও কর্মী ও সরকারী কর্মীদের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর বৈরীতা দেখা দেয়। চতুর্থতঃ স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে এন,জি,ও-গুলোকে শুধুমাত্র তাঁদের নিজেদের কাছেই জবাবদিহি করতে হয়। জনগণের কাছে জবাবদিহি করার কোন পদ্ধতি তাতে নেই। সকল এন,জি,ওই সমভাবে সফল নয়। এন,জি,ওর স্বপক্ষে যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে, তারা পরীক্ষামূলক কর্মকাণ্ড হাতে নেয় এবং প্রকৃতিগত কারণেই তারা সর্বক্ষেত্রে সফল হতে পারে না। পঞ্চমতঃ বাংলাদেশে কিছু কিছু এন,জি,ওদের মধ্যে দলাদলি ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল রয়েছে। এন,জি,ওদের মধ্যে এ ধরনের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এসব প্রতিষ্ঠানগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করেছে।৬৯ পরিশেষে বলা যায়, যদিও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকল্পে এন,জি,ওরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে তবু তাঁদের পক্ষে সারা দেশে তা সম্প্রসারিত করা সম্ভবপর নাও হতে পারে। এন,জি,ওদের রাজনৈতিক সমর্থন এবং আইনগত সিদ্ধতার ঘাটতি রয়েছে। ফলে বড় প্রকল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা সফল নাও হতে পারে।

এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশে এন,জি,ওদের ভূমিকা পরিষ্কারভাবে নির্ধারিত হয়নি। আইনগতভাবে বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো স্বেচ্ছাসেবী সমাজ-কল্যাণ প্রতিষ্ঠান (নিবন্ধীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৬১ (অধ্যাদেশ নং ৪৬, ১৯৬১) দ্বারা পরিচালিত। এই অধ্যাদেশের ধারা মতে নিবন্ধীকরণ ছাড়া কোন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা যায় না। যে কোন লোক যদি এই অধ্যাদেশকে ভংগ করে তবে তাকে জেল প্রদান বা জরিমানা করা যেতে পারে। বাইরের সাহায্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আরো কড়াকড়ি আরোপ করা হয় বিদেশী সাহায্য (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) প্রবিধান অধ্যাদেশ ১৯৭৮-এর মাধ্যমে। এসব আইনের মাধ্যমে এন,জি,ওগুলোকে কয়েকটি সরকারী এজেন্সী দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয় (যেমন, স্বরাষ্ট্র, অর্থ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়)। এন,জি,ওরা অভিযোগ তোলেন যে, সরকার নির্ধারিত আইনগত নিষেধাজ্ঞা তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রমকে ব্যাহত করে। সমস্যাটা শুধুমাত্র আইনগতই নয়। সরকারের উচিত এন,জি,ওদের ভূমিকাকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা। সরকার স্বীকৃত ভূমিকার উপরই নির্ভর করবে এন,জি,ওদের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের মাত্রা এবং তাদের স্বায়ত্ত-শাসনের পরিমাণ। সরকার এন,জি,ওদের নিম্নোক্ত উপায়ে ব্যবহার করতে পারে ঃ

—সম্পূরক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ;
—প্রতিপূরক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ;
—উদ্ভাবনী কার্যক্রম পরিচালনার প্রতিষ্ঠান হিসেবে।

বলা হয়ে থাকে যে, গ্রামীণ দারিদ্রের সমস্যা এত ব্যাপক এবং এত জটিল যে, এক্ষেত্রে এককভাবে সরকারী প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। ফলে গ্রামীণ দারিদ্র্য মোচনের জন্য সরকারী কর্মসূচীর সম্পূরক হিসেবে এন,জি,ওরা কাজ করতে পারে। এটাই যদি এন,জি,ওর উদ্দেশ্য হিসেবে স্বীকৃত হয় তবে এন,জি,ওদের পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ন্যুনতম নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ সরকার এন,জি,ও-দেরকে প্রতিপূরক এজেন্সী হিসেবে ব্যবহার করতে পারে; তারা সরকারী কর্মসূচীর বিরাজমান ফাঁকগুলো পূরণ করবে। অথবা এন,জি,ওদেরকে সরকারী কর্মসূচীর অংশ বিশেষ বাস্তবায়নের দায়িত্বও প্রদান করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, আরডি-২ প্রকল্পে গ্রামীণ দরিদ্রদের প্রশিক্ষণ প্রদানের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে কয়েকটি এন,জি,ওকে। এন,জি,ওদের যদি সরকারী কাজের প্রতিপূরক হিসেবে কাজ করতে হয় তাহলে এন,জি,ওদেরকে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। যাহোক, এন,জি, ওদের প্রধান শক্তি হচ্ছে উদ্ভাবনী কার্যক্রমগ্রহণে। উদ্ভাবনী কার্যক্রমের চিন্তা ভাবনা ও বাস্তবায়নে জন্য আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান যথাযোগ্য নয়। সরকার যদি চা্য এন, জি,ওরা সফল হোক তাহলে তাদেরকে আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখতে হবে।

৫। বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কিত প্রণিধানযোগ্য বিষয়াদি

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক দশকগুলোতে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নাটকীয় ঘটনা-বলী প্রত্যক্ষ করা গেছে। যা হোক, এসব নাটকের পাত্রপাত্রী কিন্তু গ্রামীণ দরিদ্র।

নয় সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও তাঁরা ইতিহাসে সম্পর্কশূন্য অবস্থায় ধুকে ধুকে মরছে। একজন পর্যবেক্ষক বলেছেন, "- - - - বাইরের এজেন্সী, এমন কি সরকারের উচিত নয় এটা ভাবা যে, তারা উন্নয়ন সাধন করছেন। দুর্ভাগ্যজনক-ভাবে আজকে আমরা দেখছি যে, জনগণের উন্নয়নের জন্য প্রশাসন পরিচালনা করা হচ্ছে। নীতি নির্ধারক, আমলা এবং প্রযুক্তিবিদ নিজেরা বৈদেশিক দাতা সংস্থার সাথে মিলে সিদ্ধান্ত নেয় গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য মঙ্গলকর কাজ কোনটি। তাঁরা এরপর গ্রামীণ জনগনের উপর তা চাপিয়ে দেয়। এধরণের সুচিন্তিতভাবে প্রণীত সমন্বিত কার্যক্রম গ্রামীণ লোকজনের বোধগম্য হয় না। এগুলো তাদের স্বকীয় সৃষ্টিশীলতাকে রুদ্ধ করে দেয় ও নিষ্ক্রিয়তা ও নির্ভরশীলতাকে বাড়িয়ে তোলে।"[৭০]

উৎপাদনকেন্দ্রিক উন্নয়ন থেকে গণকেন্দ্রিক উন্নয়নে উত্তরণ শুধুমাত্র রাজনৈতিকভাবেই কাম্য নয়, অর্থনৈতিকভাবেও আবশ্যকীয়। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সাফল্যের সম্ভাবনা বেড়ে যায় যদি প্রতিষ্ঠানে জনগণের অংশগ্রহণ থাকে এবং তাতে থাকে স্থানীয় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ।"[৭১] তাত্ত্বিক দিক থেকে বিকেন্দ্রীকরণের সুফলকে এভাবে চিহ্নিত করা যায়।[৭২]

—কেন্দ্রীকৃত প্রশাসনের চাইতে বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসন অধিকতর কার্যকর ও স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ।

—সমস্ত সামাজিক দলগুলোর অধিকতর প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করে বিকেন্দ্রী-করণ সরকারী সম্পদের অধিকতর সুষম বরাদ্দের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে।

—পরিকল্পনাবিদ ও সুবিধাভোগীদের মধ্যে অধিকতর মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে বিকেন্দ্রীকরণ পরিকল্পনাকে আরো বাস্তবধর্মী করে তোলে।

—ঐতিহ্যিক প্রশাসনের চাইতে বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসন প্রায়শঃই অনেক বেশী নমনীয়, উদ্ভাবনী সম্ভাবনাসম্পন্ন এবং সৃষ্টিশীল।

—বিকেন্দ্রীকরণ স্থানীয় কর্মকর্তা ও নেতৃবর্গের প্রশাসনিক ক্ষমতাকে জোরদার করে।

—এটা লাল ফিতার দৌরাত্মকে কমাতে পারে এবং আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির জটিলতাকে কাটিয়ে তুলতে পারে।

—এটা বিকেন্দ্রীকৃত কর্মকাণ্ডের রাজনৈতিক বৈধতা প্রদান করে এবং কেন্দ্রীয় আমলাদেরকে স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে অধিকতর সচেতন ও সংবেদনশীল করে জাতীয় সরকারকে জোরদার করে তুলতে পারে।

—এটা জনগণের অংশ গ্রহণকে বৃদ্ধি করতে পারে, পরিণামে স্থানীয় পর্যায়ে সরকারী এজেন্সীগুলোর জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়।

—বিকেন্দ্রীকরণ সরকারী সুযোগ-সুবিধা ও সেবার ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীদের অধিকার বৃদ্ধি করতে পারে। ফলে জীবন ধারণের মৌলিক প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে সরকারী সেবা বিতরণ অধিকতর কার্যকর হয়ে উঠে।

যা হোক, উন্নয়নশীল দেশে বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচীর বাস্তবায়ন সহজ নয়। কিছু কিছু তাত্ত্বিক অভিমত পোষণ করেন যে, বিকেন্দ্রীকরণের জন্য ন্যূনতম উন্নীত অর্থনৈতিক পর্যায় প্রয়োজন। অন্যদের বক্তব্য হচ্ছে যে, বিকেন্দ্রীকরণ নিজেই তার সাফল্যের জন্য অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে। সফল বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচীর অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে, এসব কর্মসূচীর সাফল্য নির্ভর করে বিকেন্দ্রীকরণের জন্য অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির ক্ষমতার উপর। এগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা চলে।

—রাজনৈতিক অবস্থা ;
—প্রশাসনিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থা ;
—সম্পদের অবস্থা।

রাজনৈতিক ভাবে সবচে' প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে মতাদর্শ। বিকেন্দ্রীকরণকে লক্ষ্যার্জনের একটি উপায় হিসাবে দেখা যেতে পারে ; একে শুধুমাত্র চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবেও বিবেচনা করা যেতে পারে। বিকেন্দ্রীকরণকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করলে এর রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি দুর্বল হয়ে পড়ে। মৌলিক মানবিক প্রয়োজনে বিকেন্দ্রীকরণকে রাজনৈতিক অভীপ্সার লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। জেফারসন জোর দিয়ে বলেছেন যে, কার্থেজ যতদিন অস্তিত্ববান ছিল ততদিন যেমন রোম নিরাপদ ছিল না, তেমনি, "ছোট ছোট রিপাবলিকগুলো"কে স্থানীয় পর্যায়ে সমৃদ্ধ হতে না দিলে রিপাবলিক নিজেই নিরাপদ নয়।[৭৩]

দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলাদেশের প্রায় সব বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচীই উপর থেকে সূচিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসকগণ স্থানীয় সমর্থন লাভের জন্য এবং রাষ্ট্রযন্ত্রকে জোরদার করার জন্য স্থানীয় সরকারের সৃষ্টি করেছিল। ফলে বাংলাদেশে বিকেন্দ্রীকরণের জন্য কোন মতাদর্শগত প্রতিশ্রুতি নেই। পরিণামে বিকেন্দ্রীকরণের জন্য গৃহীত কার্যক্রমে পারম্পর্য নেই। অতি দ্রুত নীতির বদল ঘটেছে এবং উপরে অবস্থিত কর্তৃত্বশীল শাসনের রাজনৈতিক ভিত্তি সৃষ্টির জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে প্রতিটি সরকার বদলের সময় এধরণের রাজনীতিকায়ণ বৈধতার সংকটের জন্ম দিয়েছে। গত দু'দশকে মৌলিক গণতন্ত্র, জেলা গভর্ণর স্কীম এবং স্বনির্ভর গ্রাম সরকার অতি দ্রুত পরিত্যক্ত হয়েছে। বাইরের অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করতে না পারলে উপজেলা পদ্ধতিকেও একই ভাগ্য বরণ করতে হতে পারে।

গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে বিকেন্দ্রীকরণ একটি প্রয়োজনীয় শর্ত, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। রাজকৃষ্ণ যথার্থই নির্দেশ করেছেন, "এলাকা স্তরে প্রতিনিধিত্বমূলক সকল প্রতিষ্ঠানে এলিটবর্গের আধিপত্য একটা সর্বগ্রাসী বাস্তবতা। এসব প্রতিষ্ঠানে কদাচিৎ দরিদ্রদের স্বার্থ ঠাঁই পায়। অনেক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের নৈমিত্তিক ফলাফল হচ্ছে উন্নয়নী আমলাতন্ত্রের দুর্নীতিবাজ অংশের যোগসাজসে

আধিপত্যকারী গ্রামীণ এলিটবর্গ কর্তৃক সম্পদের এবং প্রকল্পের সুবিধা আত্মসাৎ। এমনকি যখন প্রতিনিধিত্বমূলক স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সীমিত এবং পরামর্শদায়ী ক্ষমতা থাকে তখনও এমনটি ঘটে। তাদের ক্ষমতা যদি বৃদ্ধি করা হয় তবে আত্মসাতের পরিমাণ বাড়বে, এটাই স্বাভাবিক।"[৭৪] ডায়না কনিয়ার্সও একই ধরনের আশংকা প্রকাশ করেছেন ঃ "সত্যিকার আসল বিপদটি এই যে, বিকেন্দ্রীকরণের প্রায় সকল রূপই এলিটবর্গের অবস্থানকেই কেবলমাত্র দৃঢ়তর করবে এবং বিরাজমান বৈষম্যকে পরিব্যাপ্ত করবে।"[৭৫] অন্যদিকে রণ্ডিনেলী অবশ্য স্বীকার করেন না যে, বিকেন্দ্রীকরণ সর্বদা গ্রামীণ এলিটবর্গকে লাভবান করবে। তাঁর মতে "সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিকল্প পন্থা সৃষ্টি করে বিকেন্দ্রীকরণ দৃঢ় অবস্থানে অবস্থিত এবং জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালার প্রতি বেদরদী এবং গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি দায়িত্বহীন স্থানীয় এলিটবর্গের প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণকে নস্যাৎ করতে পারে।"[৭৬] এই বিষয়টি প্রমাণসাপেক্ষ এবং শুধুমাত্র তাত্ত্বিকভাবে এর সমাধান সম্ভব নয়। হাতের কাছে যে সব প্রমাণাদি রয়েছে তাতে গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। রণ্ডিনেলী ও চিমা পরিচালিত এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার নয়টি ঘটনা সমীক্ষা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সরকারী সুবিধা ও সেবার ক্ষেত্রে গ্রামীণ দরিদ্রদের অধিকারপ্রাপ্তি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়নি এবং প্রায় অধিকাংশ বিকেন্দ্রীকৃত প্রতিষ্ঠান জনগণের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কার্যকর পদ্ধতি বলে প্রমাণিত হয়নি।[৭৭] নাওমি কেইডেন এবং এরন উইলডাভসকি মনে করেন যে, বিকেন্দ্রীকরণের ফলে প্রকল্পসমূহ স্থানীয় এলিটবর্গের চাপের মুখে আরো নাজুক হয়ে পড়ে এবং দায়িত্ব বিভাজিত হয়ে পড়ে ; ফলে স্থানীয় এলিটবর্গ লাভবান হয়।[৭৮]

গ্রামীণ দরিদ্ররা যদি তাদের নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণে সঠিকভাবে সংগঠিত না হয় তাহলে বিকেন্দ্রীকরণ কার্যকর হতে পারে না। সরকারের তত্ত্বাবধানে সমবায়ী দল সৃষ্টি করে অবশ্য তা করা যাবে না। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, এসব সমবায়গুলো সহজেই স্থানীয় এলিটবর্গের দখলে চলে যায়। গরীবরা যেহেতু সংগঠিতও নয়, সচেতনও নয়, সেজন্য তারা স্থানীয় এলিটবর্গকে প্রতিরোধ করতে পারে না। ফলে, গ্রামীণ দরিদ্রদের সংগঠিত করার একটি পূর্বশর্ত হচ্ছে তাঁদের চেতনার মানোন্নয়ন বা পাওলো ফ্রেইরের সুপারিশ মত "সচেতনায়ন"।[৭৯] যা হোক, রাষ্ট্রীয় এজেন্সীগুলো এরকম কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে পারে না। চেতনার উন্নয়নের যে কোন প্রচেষ্টাই বিরাজমান পরিস্থিতিকে ধ্বংস করে এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সামাজিক অস্থিরতার জন্ম দেয়। আমলাতন্ত্র স্থানীয় এলিটবর্গের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত এবং গ্রামীণ এলিটবর্গের আধিপত্য নস্যাৎ করার যে কোন কর্মসূচী বাস্তবায়নে তারা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে। যা হোক, কিছু কিছু এন,জি,ও এ অবস্থা নিরসনে প্রাথমিক সাফল্য লাভ করছে। গ্রামীণ দরিদ্রদের সচেতন ও সুসংগঠিত গ্রুপের বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্তের

দেখা পাওয়া যায়।[৮০] গ্রামীণ বাংলাদেশে এধরনের দলের সংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভবপর হবে না যদি না দৃঢ় রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি এবং ঐকান্তিকতা নিয়ে কর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। এধরনের সংগঠকদের আসতে হবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মধ্য থেকে। তাঁদের প্রয়োজন হবে সরকারের পরোক্ষ সাহায্য এবং সমর্থন।

গ্রামীণ দরিদ্রদের সংগঠিত করার ব্যাপারে দু'টি প্রধান প্রশাসনিক বিষয় জড়িতঃ দলের কার্যকর বিন্যাস এবং দলের কর্মকাণ্ড। একটা দলের কার্যকর বিন্যাস কেমন হবে তা শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রণের ব্যাপ্তি এবং অর্থনৈতিক ফলপ্রসূতা দিয়ে সংজ্ঞায়িত করা যাবে না। সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতাই হবে এর নির্ধারক। প্রথমতঃ একটি কার্যকর দলের বিন্যাস সামাজিক বিন্যাসের উপর নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক পার্থক্য যেখানে উল্লেখযোগ্য নয় এবং বিভিন্ন সামাজিক দলের মধ্যে সম্পর্ক যেখানে সুবিন্যস্ত সেখানে বড় দল অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান এবং কার্যকর হতে পারে। কিন্তু যে সমাজে বিরোধ বিদ্যমান, সেখানে বড় দল কাজ করতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ ছোট দলে দলাসক্তি খুব জোরদার হয়। মনস্তত্ত্ব-বিদগণ যেমনটি বলেছেন, ছোট দল বৃহত্তর সমাজের ঝড় ঝাপটা থেকে ব্যক্তি-মানুষকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী কাঠামো হিসেবে কাজ করতে পারে।[৮১] বাংলাদেশে অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, গ্রামীণ দরিদ্রদের ক্ষুদ্র এবং সুসংহত দল বৃহৎ ও অসংহত দলের চাইতে অনেক বেশী কার্যকর। বাংলাদেশের সফল গ্রামোন্নয়নের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একই গ্রামে একটি সুসংহত দল নিয়ে একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠান গঠন করা উচিত। কুমিল্লা নিরীক্ষা প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রামে শুধু ক্ষুদে চাষীদের সংগঠিত করেছিল। ব্র্যাকের ক্ষেত্রেও গ্রামে এক থেকে দু'টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামীণ সংগঠনে ছোট ছোট দল সংযুক্ত করে। বর্তমানে বাংলাদেশে অধিকাংশ গ্রামেই কোন সংগঠন নেই। এটাকে স্থানীয় সরকারের কোন স্তর বলেও স্বীকৃতি দেয়া হয় না। ফলে, স্থানীয় কর্মকাণ্ডে অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের কোন সুযোগই গ্রামীণ দরিদ্রদের নেই।

গ্রামীণ দরিদ্রদের সংগঠিত দলের কর্মকাণ্ড নির্ধারণের ক্ষেত্রে দু'টি ব্যাপার বিবেচ্য। প্রথমতঃ স্বল্পতর কর্মকাণ্ড সম্বলিত দলের সফল হবার সম্ভাবনা কি বেশী? সমস্ত দলেরই কি একই ধরনের কর্মকাণ্ড হাতে নেয়া উচিত?

সাধারণতঃ বলা হয় যে, অধিক সংখ্যক কর্মকাণ্ডের দল দু'কারণে অধিক-তর কার্যকর। প্রথমতঃ অধিক সংখ্যক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অর্থনৈতিক সুফলও অধিক। দ্বিতীয়তঃ, গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনের পরিপূর্ণ কর্মসূচীর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে এসব কর্মকাণ্ড বিবেচিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, শুধুমাত্র ঋণই যথেষ্ট নয় যদি না সদস্যদের অন্যান্য উপকরণ ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। অধিক সংখ্যক কর্মকাণ্ডের সমস্যা হচ্ছে এই যে, এতোসব কাজ এক সাথে

চালানোর ক্ষেত্রে গ্রামীণ দরিদ্ররা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। বাংলাদেশের সফল কর্মসূচীগুলোর অভিজ্ঞতা নির্দেশ করে যে, কোন একটি দলের স্বল্পতম সংখ্যক কর্মকাণ্ড নিয়ে যাত্রা শুরু করা উচিৎ এবং সঞ্চয় ও শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে কর্মকাণ্ডের ব্যাপ্তি ঘটানো যেতে পারে।

কোন দলের কর্মকাণ্ড উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া উচিত হবে না ; দল তাদের প্রয়োজনানুসারে তা নির্ধারণ করবে। সেজন্য বাংলাদেশে গ্রামীণ ব্যাংক দলের কর্মকাণ্ডের উপর কোন বিধি নিষেধ আরোপ করে না। যা হোক, এ কৌশল সব ধরনের দলের জন্য সঠিক নাও হতে পারে। "চরম দরিদ্র" দলের কাজের ধরন "অচরম দরিদ্র" দলের কাজ কর্মের ধরন থেকে ভিন্নতর হওয়া উচিত। বাংলাদেশে অনেক চরম দরিদ্র লোকজন শুধুমাত্র বেকারই নয় তারা অপুষ্টি এবং মানসিক বৈকল্যের জন্য কর্মক্ষমও নয়।

চরম দরিদ্রদের চেতনার উন্নয়নের উদ্যোগ সফল হয়ে উঠবে না যদি না তার সাথে যোগ করা হয় সরাসরি পুষ্টি প্রকল্প, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও স্বাস্থ্য সেবার কর্মসূচী। ফলে বাইরের হস্তক্ষেপের স্তর এবং কর্মকাণ্ডের ধরন বিভিন্ন গ্রুপে বিভিন্ন ধরনের হওয়া উচিত। অধিকাংশ জাতীয় এজেন্সী দরিদ্রদের জন্য একই ধরনের কার্যক্রম হাতে নেয় ; তাদের ধারণা সমস্ত দরিদ্ররাই একই ধরনের। দরিদ্ররা আসলে "অসমরূপ লোকের সমষ্টি ; ভৌগলিক অবস্থান পরিসংখ্যানগত চরিত্র এবং পেশা ইত্যাদি দিক থেকে একদল অপর দল থেকে ভিন্ন।"[৮২]

গ্রামীণ দরিদ্ররা নিজেরা নিজেদেরকে সংগঠিত করতে পারে না। দরিদ্রদের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য বাইরের থেকে অনুঘটক একটি এজেন্সীর প্রয়োজন হয়। সরকার সাধারণতঃ এ ধরনের কর্মকাণ্ডের জন্য জাতীয় এজেন্সী প্রতিষ্ঠা করে। বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রমাণাদিতে দেখা যায় যে, পল্লী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান সমূহের সাফল্য ততই কম হবে যত বড় হবে এর আয়তন। প্রথমতঃ সরকারী সাহায্য পুষ্ট টিসিসিএ-কে,এস,এস পদ্ধতির ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, যতই এর প্রসার ঘটানো হয়েছে ততই এর সাফল্য সংকুচিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এনজিও ও গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম ছোট এলাকায় সীমাবদ্ধ। সরকারের জাতীয় কর্মসূচীগুলোর তুলনায় তাদের সাফল্য অধিক। ক্ষুদ্র অনুঘটক এজেন্সীগুলোর অধিকতর সাফল্যের জন্য তিনটি উপাদান চিহ্নিত করা যেতে পারে। এর প্রথম উপাদানটিকে ডি,সি, কর্টেন যথার্থই নির্দেশ করেছেন এভাবে—"ক্ষুদ্র শুধু সুন্দরই নয়, প্রায়শঃই এটা অধিকতর কার্যকর।"[৮৩] যুক্তরাষ্ট্রে গবেষণায় দেখা গেছে যে, বড় প্রতিষ্ঠানের চাইতে ছোট প্রতিষ্ঠান অনেক বেশী উদ্ভাবনী সম্ভাবনাময়। এমনকি বড় বড় কর্পোরেশনও ছোট ছোট স্বাধীন মতাবলম্বী গবেষণা দল সৃষ্টি করে যাতে উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে ধরে রাখা যায়। বড় বড় গ্রাম উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান সমূহ তাদের লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয় এবং সৃজনশীলতা হারিয়ে ফেলে। তৃতীয়তঃ

পল্লী উন্নয়ন এজেন্সীগুলোর ক্ষেত্রে তাদের সম্প্রসারণের সাথে সাথে কর্মকর্তা কর্মচারীদের গুণগত মান হ্রাস পায়। কুমিল্লা নিরীক্ষার অভিজ্ঞতা তাই দেখিয়েছে। বেলয়ার বলেছেন "সবচে' খারাপ দিক হচ্ছে এই যে, সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে পরিদর্শক ক্যাডার দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠে। কুমিল্লা কর্মসূচীতে পরিদর্শক হচ্ছে প্রধান চরিত্র; তাদের মধ্যে দুর্নীতির অনুপ্রবেশ পুরো নিরীক্ষার উপর গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল।"[৮৪] চতুর্থতঃ এন,জি,ও-দের মত ছোট ছোট এজেন্সীগুলো সম্পদ এবং মনোযোগ আকর্ষণের জন্য একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় রত। অপরপক্ষে পল্লী উন্নয়নের জন্য সরকারী জাতীয় এজেন্সী-গুলিতে একাধিপত্য বিদ্যমান। নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে যা বিবেচ্য তা হচ্ছে এই যে, এন,জি,ও বা সরকারী এজেন্সী যাই হোক না কেন তাদেরকে বৃহদায়তন হয়ে উঠার ব্যাপারে উৎসাহিত করা উচিত নয়। গুটি কয়েক বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে অনেক ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের সম্ভাবনা অধিকতর।

বিকেন্দ্রীকৃত কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন শুধুমাত্র রাজনৈতিক এবং প্রশাস-নিক সমর্থনের উপরই নির্ভরশীল নয় বরং নিরবচ্ছিন্ন এবং সময় মত সম্পদের প্রাপ্তির উপরও নির্ভরশীল। সাম্প্রতিক অতীতে বাংলাদেশে স্বেচ্ছা ভিত্তিতে স্থানীয় শ্রমকে কাজে লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। স্যার আর্থার লুইসের তত্বমতে শ্রমের সীমাহীন সরবরাহের মাধ্যমে লুক্কায়িত সম্পদের আকর বাংলাদেশে নেই। ফলে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে যে সব প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল সেগুলো উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সাফল্য অর্জন করেনি। সফল বিকেন্দ্রীকরণের সম্পদের ক্ষেত্রে দু'টো শর্ত রয়েছে। প্রথমতঃ স্থানীয় সরকারকে পর্যাপ্ত সম্পদ সরবরাহ করার জন্য সাংবিধানিক ও বৈধ নিশ্চয়তা প্রদান করা দরকার। রাজস্ব ভাগাভাগির ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে এটা করা যেতে পারে। সাধারণতঃ জাতীয় সরকার বিরাজমান শর্ত সাপেক্ষে অনুদান প্রদানের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারকে রাজনৈতিক ভাবে কাজে লাগায়। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন উপায়ে বাইরের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তাকে হ্রাস করা যেতে পারে। গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ সামাজিক সেবা (যেমন শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সুবিধা) বিনা মূল্যে দেয়া হয়। স্থানীয় প্রতিষ্ঠান-গুলো ধনী দরিদ্রের পার্থক্য মনে রেখে সমাজের ধনীদেরকে তুলনামূলকভাবে অধিকতর ফি প্রদানে বাধ্য ক'রে এধরনের কার্যক্রমের আংশিক ব্যয় বহন করতে পারে। বিরাজমান প্রকল্পগুলোর কাঠামো বদল করে অনেক সামাজিক ব্যয় সংকোচন করার সুযোগ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মূলধন নির্ভর, হাসপাতাল কেন্দ্রিক স্বাস্থ্য কর্মসূচী এবং প্রতিকারমূলক স্বাস্থ্য সেবার ব্যয় অত্যন্ত অধিক। স্বাস্থ্য কর্মসূচী অধিকতর কার্যকর ও আর্থিকভাবে ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে যদি প্রতিকারমূলক ঔষধের পরিবর্তে প্রতিষেধক ঔষধের গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং উচ্চ শিক্ষিত পেশাজীবিদের পরিবর্তে প্যারামেডিকদের উপর জোর দেয়া হয়। লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার ঘটিয়ে ব্যয় সংকোচনের এটা একটা উপায়।

৬। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের (জিকে) ঘটনা সমীক্ষা

বাংলাদেশে বিকেন্দ্রীকরণের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায়ে অংশগ্রহণ তলিয়ে দেখার জন্য বাংলাদেশের একটি এন,জি,ও—জিকে-র উপর একটি ঘটনা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছিল। একটি গভীর বিশ্লেষণধর্মী সমীক্ষার জন্য জিকে-কে বাছাই করার পেছনে মূল কারণসমূহ নিম্নরূপ ঃ—

—বাংলাদেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ চরম দরিদ্র এবং তারা অপুষ্টিতে ভোগে। তৃণমূল পর্যায়ে যদি বিকেন্দ্রীকরণের কার্যক্রমের সাথে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম যুক্ত না করা হয় তবে তা লক্ষ্যদলের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পাবে না। জিকে প্রতিষেধক স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি শিক্ষা এবং প্রতিকারমূলক স্বাস্থ্য সেবা এবং পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অর্থবহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনা করেছে।

—বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রকল্প বাইরের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। স্বাস্থ্য বীমা স্কীম এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য জিকে স্থানীয় সম্পদ আহরণের প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

—জিকে অবহেলিত গ্রুপ বিশেষ করে মেয়েদের কর্মসংস্থানের প্রচেষ্টায় রত। "পুরুষ শাসিত শ্রেণীভিত্তিক সমাজে মহিলাদেরকে তাঁদের ঐতিহ্যিক পরাধীনতার চেতনা থেকে মুক্ত করার" পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে জিকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

—জিকে প্রতিনিয়ত শিক্ষারত ; গত চৌদ্দ বছরে গ্রামীণ দরিদ্রদের সংগঠিত করার ব্যাপারে জিকে মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। সারথী এলাকার বাইরেও ক্ষুদ্রাকারে এই মডেলের সম্প্রসারণ ঘটানো হয়েছে।

—অনুঘটকদের প্রাণচঞ্চল একটি ক্যাডারের প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে এটা সফল হয়েছে। গ্রামীণ দরিদ্রদের সংগঠিত করার ব্যাপারে তাঁদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের সময় জিকে মাঠ পর্যায়ের একটি হাসপাতাল হিসেবে কাজ শুরু করে। এ কয় বছরে জিকে-র উদ্দেশ্য বদলেছে—আহত মুক্তিযোদ্ধাদের শুশ্রূষা করার পরিবর্তে জীবনের মৌল প্রয়োজন মেটানোর জন্য সমাজ পরিবর্তনই এখন তাদের লক্ষ্য। দেশের মুক্তির পর এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি পদ্ধতি গড়ে তোলা যাতে একটি বিশেষ এলাকার পুরো জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য পরিচর্যার কাজে সবচে' কম খরচে বেশী সুফল লাভ নিশ্চিত করা যায়, সীমিত সংখ্যক স্বাস্থ্য জনশক্তির নিয়োগের মাধ্যমে যৌথভাবে ও সুচারু রূপে সম্পন্ন করা যায়। '৮০-র গোড়ার দিকে জিকে খোলাখুলিভাবে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও সমাজ উন্নয়নে নিজেকে নিবেদন করে। বর্তমানে জিকে-র নিজের সম্পর্কে ধারণা হচ্ছে এই যে, এটা "একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যা নতুন সমাজ সৃষ্টির জন্য কাজ করে যাচ্ছে এবং সেই সমাজের জন্য দরিদ্র এবং অত্যাচারিতদেরকে লড়াই করতে হবে।"[৮৬] জিকে-র অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে, গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য আলাদা আলাদাভাবে প্রণীত কর্মসূচী কাজ করেনা। অপুষ্টি ও ক্ষুধার সমস্যা আর্থ সামাজিক অবস্থা থেকে আলাদা করে সমাধান করা যাবেনা।

নিম্নোক্ত ধারণাগুলোর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে জিকে স্বাস্থ্য প্রকল্প ঃ

(১) পুঁজিনির্ভর স্বাস্থ্য পরিচর্যা পদ্ধতি দরিদ্রদের সেবা বিতরণ করতে পারে না। বিদ্যমান সরকারী পদ্ধতি বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য গুটি কয়েক শিক্ষিত ডাক্তারের উপর নির্ভরশীল; এই প্রচেষ্টার প্রতিপূরক হিসেবে কোন মাঠ পর্যায়ের কর্মীর অস্তিত্ব নেই। জিকে-র মৌলিক কৌশলটি হলো জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য একদল প্যারামেডিক সৃষ্টি। সীমিত সংখ্যক সাধারণ অসুখের চিকিৎসা করার জন্য প্যারামেডিকদেরকে প্রশিক্ষিত করে তোলা যায়।

(২) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটি সদর দপ্তরে চিকিৎসা কার্যক্রম চালায়। মাঠে যে সকল রোগ জটিল বলে ধরা পড়ে সেগুলো সদর দপ্তরে পাঠানো হয়। সকল শিক্ষিত ডাক্তারগণ সদর দপ্তরে অবস্থান করেন। সদর দপ্তরে প্যারা-ম্যাডিকদেরকে শ্রেণীকক্ষ প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়। সদর দপ্তরে একটি ছোট হাসপাতালও রয়েছে; যেসব রোগীকে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের মধ্যে রাখতে হয়, তাদেরকে সেখানে রাখা হয়।

(৩) জিকে-র আটটি উপকেন্দ্র রয়েছে। সেখান থেকে মহিলা ও পুরুষ কর্মীরা লোকজনের বাড়ীতে বাড়ীতে সেবা প্রদান করে। একটি উপকেন্দ্রের দায়িত্বে থাকেন একজন সিনিয়র প্যারামেডিক। অন্যান্য প্যারামেডিকদেরকে নৈমিত্তিক গৃহ পরিদর্শনের জন্য নির্দিষ্ট গ্রাম বরাদ্দ করা হয়। প্রশিক্ষণরত প্যারামেডিকদেরকে সিনিয়র প্যারামেডিকগণ হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেন। সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন জিকে সদর দপ্তর থেকে শিক্ষিত ডাক্তার উপকেন্দ্র পরিদর্শনে যান। তিনি জটিল কেইসগুলো দেখেন এবং প্যারামেডিকদের তদারক করেন ও পরিচালনা করেন। বর্তমানে জিকে-র সদর দপ্তর ২টি ও বাইরে ৬টি উপকেন্দ্রে ৫৩ জন প্যারামেডিক কাজ করছে।

(৪) জিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্যারামেডিকদের একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গড়ে তুলেছে। জিকে শিক্ষানবিস হিসেবে স্বল্পবয়েসী ছেলেমেয়েদের নিয়োগ করে—যাঁরা মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পাশ করেছে বা যাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা আরো নিচু স্তরের। প্রশিক্ষণটি ব্যবহারিক, তাত্ত্বিক নয়। ফলে কোন কড়াকড়ি সময়সূচী, কার্যক্রম নেই এতে, এবং পূর্ব নির্ধারিতও নয় এটা। এতে আনুষ্ঠানিক পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই। নিয়োগের পর পরই একজন শিক্ষানবিসকে একজন সিনিয়র প্যারামেডিকের সাথে যুক্ত করে দেয়া হয়। শিক্ষানবিস তাঁর সিনিয়রের কর্মকাণ্ড খুব মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ করেন। এই পর্যবেক্ষণ-কালে শিক্ষানবিস তাঁর সহকর্মীর নিকট বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজেন। হাতে কলমে এই প্রশিক্ষণ বাদেও প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ডাক্তার বা সিনিয়র প্যারামেডিক পরিচালিত কিছু কিছু আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ অধিবেশনে যোগ দিতে হয়। এই শিক্ষণ পদ্ধতি অত্যন্ত অংশগ্রহণমূলক এবং বক্তৃতা প্রদানের চাইতে আলোচনার উপরই এতে বেশী জোর দেয়া হয়। প্যারা-মেডিকদের প্রশিক্ষণ কোর্সে তিনটি পর্যায় রয়েছে। প্রতিটি পর্যায়ের মেয়াদ প্রায় এক বছর। প্রথম পর্যায়ে একজন প্রশিক্ষণার্থী সামগ্রিক চিকিৎসা কার্যক্রমের

প্রচলিত ধারা ও পদ্ধতি সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষা দেয়া হয় কিভাবে রোগীকে পরীক্ষা করতে হয়, প্রশ্ন করতে হয় এবং কেইস নথি লিখতে হয়। সর্বশেষে পর্যায়ে ক্ষত ব্যাণ্ডেজ করা এবং সাধারণ অসুখ বিসুখে ব্যবস্থাপত্র লিখন শিক্ষা দেয়া হয়। যখন প্রশিক্ষণার্থী সিনিয়র এবং তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তার কর্তৃক বাড়ী বাড়ী একা পরিদর্শনের জন্য এবং ডাক্তারী দায়িত্ব নেয়ার জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয় তখনই তার শিক্ষানবিসকাল সমাপ্ত হয়। প্যারামেডিকদের ভালো কাজের জন্য পুরস্কার এবং অদক্ষতার জন্য শাস্তিরও ব্যবস্থা আছে।

(৫) ১৯৭৩ সালের গোড়ার দিকে জিকে-র স্বাস্থ্য বীমা স্কীম চালু করা হয়। প্রথমে পরিবার পিছু ১০·০০ টাকা ভর্তি ফি এবং ২ টাকা মাসিক প্রিমিয়াম দিতে হতো। সব ধরনের অর্থনৈতিক গ্রুপের জন্য একই হার ধার্য করা হয়েছিল। সারথী এলাকায় এই বীমা পরিকল্পনায় শুধুমাত্র শতকরা ৩১ ভাগ পরিবার সাড়া দেয়; ফলে স্কীম ব্যর্থ হয়। দরিদ্রদের বীমা ফি প্রদানের অক্ষমতাই এ ধরনের কার্যক্রমের ব্যর্থতার পেছনে কাজ করেছে। ফলে বীমার হার পুনর্নির্ধারণ করা হয় এবং ভোক্তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে বিভিন্ন হারে ফি ধার্য করা হয় (সারণী-৫ দেখুন)।

সারণী—৫

জিকে-র স্বাস্থ্য বীমার সংশোধিত হার

	বীমার হার	হাসপাতালের হার
(১) দরিদ্র ঃ ভূমিহীন ও অন্যান্য—যাঁরা দিনে দু'বেলা আহার জুটাতে পারে না	ভর্তি ফি নেই। ঔষধ ও পরিবারের প্রতি সদস্যের ডাক্তার দেখানোর জন্য ০·৫ টাকা।	বিনামূল্যে
(২) মধ্য আয় ঃ যাঁরা বেঁচে থাকার জন্য উৎপাদন করে কিন্তু যাদের কোন উদ্বৃত্ত নেই	পরিবারপিছুভর্তি ফি১২টাকা। পরিবার পিছু বার্ষিক নবায়ন ফি ১০ টাকা। প্রতিজনকে ডাক্তার দেখানো—৫ টাকা।	হাসপাতাল ভর্তি ফি ৫ টাকা। চিকিৎসা ফি ১৫ টাকা দৈনিক সিট ভাড়া ২ টাকা।
(৩) ধনী ঃ যাদের উদ্বৃত্ত সম্পদ রয়েছে	পরিবার পিছু ভর্তি ফি ১২ টাকা। পরিবার পিছু বার্ষিক নবায়ন ফি ১০ টাকা এবং জন প্রতি ডাক্তার দেখানোর ফি ১০ টাকা।	হাসপাতাল ভর্তি ফি ১০ টাকা। চিকিৎসা ফি ২৫ টাকা। দৈনিক সিট ভাড়া ৪ টাকা।

উৎস ঃ এ,টি,এম,শামসুল হুদা "গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিচর্যা পদ্ধতি ঃ গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের একটি ঘটনা সমীক্ষা।"

জিকে-র স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান প্রধান সাফল্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

(ক) জিকে-র স্বাস্থ্য বীমা কর্মসূচী উপজেলার দু'টি ইউনিয়নের ১০০ হাজারেরও অধিক লোকজনের নিকট বিস্তৃত করা হয়েছে। দাবী করা হয় যে প্রকল্প এলাকার শতকরা ১০০ ভাগ খানাই স্বাস্থ্য বীমা কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছে।

(খ) চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় মোট আবর্তক ব্যয়ের শতকরা ৫৬ ভাগই আদায় করা হয় বীমা এবং অন্যান্য সেবায় প্রাপ্ত ফি থেকে।

(গ) জিকে প্রদত্ত স্বাস্থ্য সেবা জাতীয় কর্মসূচীর চাইতে অধিকতর কার্যকর এবং স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ।[৮৭] বিরাজমান সরকারী কর্মসূচীর মূল্যায়নে দেখা যায় যে, সরকারী স্বাস্থ্য সেবার ব্যবহার অত্যন্ত নিম্নমানের।

(ঘ) জিকে প্যারামেডিকগণ সারথী এলাকায় পরিবার পরিকল্পনাকে জনপ্রিয় করে তোলার ব্যাপারেও সফলকাম হয়েছে।

জিকে-র কার্যক্রম শুধুমাত্র স্বাস্থ্য সেক্টরেই সীমাবদ্ধ নয়। এসব কার্যক্রম আস্তে আস্তে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। জিকে-র নিম্নোক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষাণগুলো বিশেষভাবে আলোচনার দাবী রাখে ঃ

(১) জিকে মহিলা কেন্দ্র। জিকে-র মহিলা কেন্দ্র হচ্ছে দক্ষতা উন্নয়ন ও সচেতনায়ন কর্মসূচীর একটি সংমিশ্রণ। এটা মহিলাদের বৃত্তি প্রশিক্ষণের উপর জোর দেয়। শুধুমাত্র মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্যই নয় বরং পুরুষদের চিরাচরিত দাবী—পুরুষরা মহিলাদের চাইতে অধিক কর্মক্ষম—তাকেও মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্য এই কেন্দ্র কাজ করে। তাঁদের কর্মকাণ্ডে রয়েছে সাক্ষরতা এবং সচেতনায়ন ক্লাস, সেলাই কর্মসূচী, হস্তশিল্প, কাঠের কাজ, জুতা তৈরী, রুটি তৈরী এবং ছাপাখানা। যা হোক, কেন্দ্রের বাইরে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মহিলা কেন্দ্রের প্রশিক্ষণার্থীগণ বাধার সম্মুখীন হচ্ছে।

(২) জিকে একটি নিরীক্ষাধর্মী স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেছে। স্কুলগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা পদ্ধতি হতে ছিটকে পড়া ছাত্রদের শিক্ষা পদ্ধতির আওতায় আনা। এ পরীক্ষা-নিরীক্ষাটির পেছনে যে ধারণা কাজ করে তা হচ্ছে পারিবারিক শ্রমে অংশগ্রহণের অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার জন্যই দরিদ্র শিশুদের স্কুলের শিক্ষা বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেজন্য, জিকে স্কুল ছাত্রদের পরিবারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহনের সুযোগ প্রদান করে। গৃহে যে সব শিশুদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে তারা "পরিবারের কাজের সাথে স্কুলের কাজের" সমন্বয় ঘটিয়ে তাদের কর্ম সম্পাদন করে। উদহরণস্বরূপ, ক্লাশে তাঁরা তাঁদের ছোট ভাইবোনদের নিয়ে আসতে পারে অথবা স্কুল থেকে যাবার পথে গোবর কুড়াতে পারে। নিয়মিত স্কুলে উপস্থিতির জামানত হিসেবে স্কুল ফি সংগ্রহ করা হয়। যাঁরা জিকে স্কুলে আসতে পারে না তাঁদের জন্য গ্রাম স্কুল গড়ে তোলা হয়। মূলতঃ বয়েসী ছাত্ররাই সেসব স্কুল চালায়। জিকে স্কুলের শিক্ষকরা সে সব স্কুল পরিদর্শন করে।

(৩) গণ-খামার এবং ভূমিহীনদের কর্মসূচী। জিকে একটি যৌথ খামার চালায়, যেখানে জিকে সদর দপ্তরের কর্মচারীদেরকে প্রতি সকালে কাজ করতে হয়। এই বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণের পেছনে যে যুক্তিটি কাজ করে তা হচ্ছে—বাংলাদেশের কৃষি সমাজে যে শোষণ বিদ্যমান রয়েছে প্রতিদিনকার শারিরীক শ্রমের মাধ্যমে তাঁদের মনে সেই বোধকে জাগরুক রাখা। ১৯৭৭ সালে জিকে ভূমিহীন ও এক একর পর্যন্ত জমির মালিক কৃষকদেরকে লক্ষ্যদল হিসেবে চিহ্নিত করে তার সম্প্রসারণ কর্ম শুরু করে। জিকে ইতিমধ্যে ২ মিলিয়ন টাকাও বিতরণ করেছে। খাই খালাশী ভিত্তিতে জমি কেনার জন্য যৌথ ঋণ নেয়ার জন্যও ভূমিহীন গ্রুপকে উৎসাহিত করা হয়। যা হোক, জমি যৌথভাবে চাষ করা হয় না এবং সবচে' উচ্চ নীলাম ডাককারীকে নিলামে জমি দেয়া হয়।

জিকে একটি সামান্য প্রকল্প হিসেবে কাজ শুরু করেছিল। বর্তমানে একটি সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর রূপ লাভ করেছে। কর্মসূচীর ব্যাপ্তিও শুধু সাভার উপজেলার সারথী এলাকায় সীমাবদ্ধ নেই। জামালপুর জেলার ভাতশালা ও গাজীপুর জেলার শ্রীপুর ও সাটুরিয়া উপজেলায় এই কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ঘটানো হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে লোকজনকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য জিকে মাতৃভাষায় জার্নাল, বইও প্রকাশ করেছে।

বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড সত্ত্বেও জিকে-র কতগুলো বড় বড় দুর্বলতা রয়েছে। প্রথমতঃ জিকে-র কার্যক্রম কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত। কথিত আছে যে, জিকে-র গ্রুপ সমূহ তাদের সমস্যার ব্যাপারে বা কেন্দ্রের সাথে তাদের সম্পর্কের ব্যাপারে বাইরের লোকজনের সাথে আলোচনা করে না; এ ব্যাপারে কেন্দ্র থেকে পূর্বানুমতি লাগে।[৮৮] যাহোক, জিকে-র পক্ষ থেকে যুক্তি দেখানো হয় যে, এলাকার কায়েমী স্বার্থবাদী মহল এই প্রতিষ্ঠানটিতে শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি ও শারিরীক বল প্রয়োগের মাধ্যমে ধ্বংস করার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে কেন্দ্রীকরণ বিকেন্দ্রীকৃত গ্রুপের টিকে থাকার একটি অবশ্য পালনীয় পূর্ব-শর্ত। দ্বিতীয়তঃ স্বাস্থ্য কর্মসূচী ছাড়া অন্য সব কর্মকাণ্ডের সাফল্য খুবই নগণ্য। এত ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠানটি পর্যাপ্তভাবে সজ্জিত নয়। পরিশেষে, টিকে থাকার জন্য এটা এখনো বাইরের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। ১৯৭৯ সালের একটি বিশদ নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রতিষ্ঠানটি তার মূল এবং চলতি ব্যয়ের শতকরা ৫০ ভাগের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল ছিল।[৮৯]

এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গ্রামীণ দরিদ্রদের স্বাস্থ্য রক্ষার একটি দক্ষ ও কার্যকর পদ্ধতি সৃষ্টিতে জিকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে। অনুসরণের জন্য অন্যান্য এজেন্সী এই পদ্ধতির নিম্নলিখিত উপাদানগুলো বিবেচনা করতে পারে ঃ

(১) পুঁজি-নির্ভর চিকিৎসার পরিবর্তে প্যারামেডিকদের উপর নির্ভরশীল প্রাথমিক চিকিৎসা। জিকে-র অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে, স্বাস্থ্য সেবা বিতরণের ক্ষেত্রে প্যারামেডিকগণ উচ্চ শিক্ষিত ডাক্তারদের চাইতে অনেক বেশী কার্যকর। বিরাজমান সামাজিক অবস্থায় যাঁরা বঞ্চিত, বিশেষ করে সেই সব শিশু ও নারীদের

ক্ষেত্রে এটা অধিকতর সত্য। মহিলা প্যারামেডিক নিয়োগের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও আশাপ্রদ ফল দেখিয়েছে। প্যারামেডিকদেরকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে বিনিয়োগও কম ; এতে চিকিৎসার দ্রুত প্রসার ঘটে এবং বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। গ্রামীণ দরিদ্রদের সমন্বিত প্রকল্পে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা পদ্ধতির একটি উপাদান যুক্ত হওয়া উচিত।

(২) হাতে কলমে প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ। জিকে-র সফল প্রশিক্ষণ পদ্ধতি দেখিয়েছে যে, হাতে কলমে প্রশিক্ষণ তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণের চাইতে অনেক বেশী কার্যকর। এ ধরনের প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণার্থীগণকে গ্রামীণ জীবনের বাস্তবতার মুখোমুখি করে। ঐতিহ্যিক ডাক্তারী শিক্ষায় কোন সামাজিক মাত্রা নেই। জিকে পদ্ধতিতে প্যারামেডিকগণ গ্রামীণ দরিদ্রদের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক ও স্বাস্থ্য বিষয়ে পারস্পরিক সম্পৃক্ততা ও সার্বিক সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার সুযোগ লাভ করে। একজন সিনিয়র প্যারামেডিকের ঘনিষ্ট তত্ত্বাবধান এবং সময় সময় শিক্ষিত ডাক্তারের দিক নির্দেশনা শিক্ষানবিসদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করে। একই সময়ে প্যারামেডিকগণ সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে পরিচিত হয়ে উঠে। পল্লী উন্নয়ন কর্মীদের আনুষ্ঠানিক, প্রতিষ্ঠান নির্ভর এবং তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণকে জিকে-র পরীক্ষা-নিরীক্ষার আলোকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো উচিত।

(৩) খরচ আদায়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বর্তমানে জিকে স্বাস্থ্য পরিচর্যা পদ্ধতির আবর্তক ব্যয়ের (মূল ব্যয় বাদে) শতকরা ৫৬ ভাগ আদায় করে। যা হোক, জিকে-র কার্য পরিচালনা খরচ খুব কম। প্যারামেডিকদের ব্যাপক ব্যবহার, মাথাপিছু স্বল্প হার খরচ এবং জিকে-র নিজের তৈরী সস্তা বর্গীয় ঔষধের জন্য খরচের এই স্বল্পতা। জিকে-র অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে, চরম দারিদ্রের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও সামাজিক কৃত্যকের খরচ আদায় সম্ভব। যেটা দরকার তা হচ্ছে, সামাজিক সেবার মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতির মধ্যে স্তরায়ন, যাতে গ্রামীণ ধনীরা এ ধরনের কার্যক্রমে আনুপাতিকভাবে অধিকতর খরচ বহন করে। সরকারী সুবিধাদি প্রদানের ক্ষেত্রে ধনী এবং দরিদ্রদেরকে একইভাবে বিচার করা উচিত নয় ; দরিদ্রদেরকে ধনীদের চাইতে একটু বেশী সুবিধে দেয়া দরকার।

(৪) শিক্ষণ প্রক্রিয়া। জিকে তার কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে "পূর্ব পরিকল্পিত পদ্ধতি" নিয়ে যাত্রা শুরু করেনি। জিকে কোন তাত্ত্বিক ধারণার উপর গুরুত্ব প্রদান করেনি। অভিজ্ঞতার আলোকে প্রকল্পের পরিবর্তন, পরিবর্ধন করা হয়েছে। প্রকল্পটি কয়েকটি মাত্র ক্রিয়াকাণ্ড নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল এবং আস্তে আস্তে তা সম্প্রসারিত হয়েছে।

উপসংহার ও নীতিগত তাৎপর্য :

বাংলাদেশে গ্রামীণ দারিদ্রের বিমোচন একটি বেদনাবহ দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া হয়ে থাকবে। এরকম ভঙ্গুর সম্পদ ভিত্তি, ব্যাপক বেকারত্ব, দ্রুত বর্ধমান জন-

সংখ্যা এবং শোষণমূলক সামাজিক কাঠামো নিয়ে তার দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা খুব আশাপ্রদ নয়। দরিদ্রদের দরিদ্রতর হবার সম্ভাবনাই অধিক, যদি না বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁদের কার্যকর অংশ-গ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়। অতীতে উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া পল্লী উন্নয়নের উদ্যোগকে গ্রামীণ জীবন নিয়ন্ত্রণকারী স্থানীয় এলিটবর্গ নস্যাৎ করে দিয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত নেতাদের কাছে যখন ক্ষমতা অর্পণ করা হবে তখন এর প্রধান সুবিধাভোগী হওয়ার সম্ভাবনা এই এলিটবর্গেরই বেশী। দরিদ্ররা যদি তাঁদের স্বার্থ রক্ষা করতে না পারে তবে বিকেন্দ্রীকরণ ও পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম থেকে তাঁরা কোন সুফলই পাবে না। অর্থনৈতিক উন্নয়ন দরিদ্রদের কাছে ঈশ্বর প্রদত্ত নেয়ামত হিসেবে আসবে না; রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিকে তাঁদেরকে তা অর্জন করতে হবে। এধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রথম পূর্বশর্ত হচ্ছে দরিদ্রদের চেতনাকে জাগ্রত করা। এটা দরিদ্ররা নিজেরা করতে পারবে না। সচেতনায়নে অনুঘটকদেরকে বাইরে থেকে আসতে হবে। যা হোক, ঐতিহ্যিক আমলাতন্ত্রের যেহেতু গ্রামীণ এলিটবর্গের সাথে স্থায়ী যোগসাজস রয়েছে তাই তারা এ দায়িত্ব পালন করতে অক্ষম। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এবং সেই সাথে রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিকেন্দ্রীকরণের আদর্শ অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে।

বাংলাদেশের দরিদ্ররা সমরূপী নয়। দরিদ্রদের নিজেদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পার্থক্য বিদ্যমান। গ্রাম বাংলায় শোষণ শুধু ধনী আর দরিদ্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; 'অচরম দরিদ্ররাও' "চরম দরিদ্র"দেরকে শোষণ করে। সেজন্য চরম দরিদ্রদের অবস্থার উন্নতিকল্পে বিশেষ কর্মসূচী প্রণয়ন করতে হবে। চরম দরিদ্রদের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডই যথেষ্ট নয়; তাদেরকে পুষ্টি এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার ব্যাপারে সরাসরি সাহায্য প্রদান করতে হবে। এই পর্যায়ে একটি এন,জি,ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের (জিকে) পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিশেষ মনোযোগের দাবী রাখে।

সাম্প্রতিক অতীতের বাংলাদেশ বিকেন্দ্রীকরণ ও পল্লী উন্নয়নের একরাশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রত্যক্ষ করেছে। প্রসিদ্ধ কুমিল্লা মডেল কর্তৃক স্থানীয় সরকার ও সমবায়ের মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকরণ গড়ে তোলার একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরি-চালিত হয়েছে। যা হোক, মডেলটির বিভিন্ন উপাদানকে শাসকগোষ্ঠী রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করেছে এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনকে কাটিয়ে তোলার প্রয়োজনে এর মূল কর্মসূচীর বাস্তবায়ন ঘটানো হয়নি। মডেলটিকে কোন ক্রমেই সুষ্ঠু বাস্তবায়নের সুযোগ দেয়া হয়নি। ফলে এটা দায়সারাগোছের উৎপাদন-কেন্দ্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হিসেবেই থেকে গেছে। বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত নীতিমালার বদল ঘটেছে। বৈধতার সংকট প্রায়শঃই প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগসমূহকে নস্যাৎ করেছে এবং রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য সরকারও তাকে বিনষ্ট করেছে। এ ব্যাপারে জেলা গভর্নর স্কীম ও

স্বনির্ভর গ্রাম, সরকার উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিক অতীতে সরকার দু'টি সম্ভাবনাময় পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনা করেছে। প্রথমতঃ নির্বাচিত চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে উপজেলা ব্যবস্থার সূচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প প্রমাণ করেছে যে, গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য ব্যাংক সুবিধা প্রদান বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক। গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং এর কর্মকাণ্ডের পরিধি ইচ্ছাকৃতভাবে সীমিত রাখা হয়েছে।

সাফল্যজনক তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এন,জি,ও-রাও কৃতিত্ব দেখিয়েছে। তারা সচেতনায়ন ও অংশগ্রহণমূলক কর্ম গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনা করেছে। কিছু কিছু এন,জি,ও লাগসই প্রযুক্তি বিস্তারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। লক্ষ্যদলের কাছে সেবা পৌঁছানের ব্যাপারেও তারা সাফল্য অর্জন করেছে। যা হোক, প্রায় সকল এন,জি,ও-র কর্মকাণ্ডই ছোট ছোট এলাকায় সীমাবদ্ধ। এন,জি,ও এবং অন্যান্য পল্লী উন্নয়ন এজেন্সীর সাফল্য বিপরীতভাবে এদের আয়তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

পূর্ববর্তী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নির্দেশ করে যে, গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে বিকেন্দ্রীকরণকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য নিম্নলিখিত পন্থা অনুসরণ করা যেতে পারে ঃ

(১) যতক্ষণ না গ্রামীণ দরিদ্রগণ তাঁদের নিজস্ব স্বার্থ সংরক্ষণে সঠিকভাবে সংগঠিত হতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিকেন্দ্রীকরণ কার্যকর হবে না। গ্রামীণ দরিদ্রদেরকে সচেতন করে তুলতে হবে এবং বহিরাগত অনুঘটকদের দায়িত্ব পালন করতে হবে তাঁদের সংগঠকের। রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং স্বেচ্ছাসেবী এজেন্সী সমূহ হতে আসবে এ ধরণের পরিবর্তন আনয়নকারী এজেন্ট।

(২) বিকেন্দ্রীকরণকে লক্ষ্যার্জনের জন্য একটি উপায় মাত্র বলে বিবেচনা করলে চলবে না। বিকেন্দ্রীকরণকেই চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এ ধরনের মতাদর্শগত প্রতিশ্রুতি বিকেন্দ্রীকরণ কার্যক্রমকে রাজনৈতিক অপ-ব্যবহার হতে এবং রাজনৈতিক সুবিধা হাসিলের জন্য নীতিমালার বিভ্রান্তিকর পরিবর্তন হতে রক্ষা করবে।

(৩) গ্রামীণ দরিদ্রদের গ্রুপ হওয়া উচিত সমরূপ এবং ছোট ছোট। দরিদ্ররা বড় প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

(৪) পল্লী উন্নয়নের জন্য সরকারী এজেন্সী এবং এন,জি,ওদেরকে খুব বড় প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠার ব্যাপারে উৎসাহিত করা উচিত নয়। পল্লী উন্নয়নের ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান শুধু মাত্র সুন্দরই নয়; কার্যকরও বটে। গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য বৃহৎ প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যকারিতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য কিছু বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের চাইতে অধিক সংখ্যক ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাই মঙ্গলকর।

(৫) দরিদ্ররা সমরূপ নয়। চরম দরিদ্রদের জন্য কর্মসূচী অচরম দরিদ্রদের চাইতে ভিন্নতর হওয়া উচিত। চরম দরিদ্রদের জন্য লাগসই স্বাস্থ্য পরিচর্যা পদ্ধতি ও পুষ্টি কার্যক্রম পরিচালনা করা দরকার। মহিলা ও শিশুদের মত পশ্চাৎপদ গ্রুপের জন্য বিশেষ ধরনের কর্মসূচী নেওয়া উচিত।

(৬) বাংলাদেশে জিকে এবং ব্র্যাকের অভিজ্ঞতার আলোকে বিদ্যমান এলিটধর্মী ও পুঁজি নির্ভর স্বাস্থ্য পরিচর্যা পদ্ধতিকে ঢেলে সাজানো উচিত। পুরোপুরি শিক্ষিত পেশাজীবীদের চাইতে প্যারামেডিকদের উপর নির্ভরতা বাড়ানো উচিত।

(৭) সরকারী তহবিল হতে সামাজিক সেবার ব্যয়ভার কমানোর জন্য স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে বিভিন্ন হারে ফি নির্ধারণের বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা উচিত। এসব সেবার ক্ষেত্রে যাতে ধনীদেরকে বেশী অর্থ ব্যয় করতে হয় তার ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

(৮) পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অপ্রাতিষ্ঠানিক হাতে কলমে প্রশিক্ষণের উপর জোর দেয়া উচিত। প্যারামেডিকদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে জিকে-র অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক ঐতিহ্যিক প্রশিক্ষণে বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করা উচিত।

(৯) এন.জি.ওদের ভূমিকা স্পষ্টভাবে বিধৃত করা দরকার। তাদেরকে উদ্ভাবনীমূলক কাজকর্মে উৎসাহিত করা উচিত এবং আমলাতান্ত্রিক বেড়াজাল থেকে তাদেরকে মুক্ত রাখা উচিত।

উপরোল্লিখিত সুপারিশসমূহের বাস্তবায়ন খুব সহজসাধ্য কাজ হবে না। যথার্থই বলা হয়েছে যে, "সবচাইতে ভালো অবস্থায়ও বিকেন্দ্রীকরণ দুঃসাধ্য। অনেক লোকজন---রাজনীতিবিদ, প্রশাসক, প্রযুক্তিবিদ এমনকি পণ্ডিতবর্গ তাঁদের নিজেদেরকে ক্ষমতা পরিত্যক্ত দেখতে চায় না। স্থায়িত্বহীন ও অনিশ্চিত পরিবেশে ক্ষমতার এই রদবদল আরো দুঃসাধ্য- - - -। একটা প্রকল্প দলিলে কোন ক্রমেই বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করা যায় না। যদিও দুর্ভাগ্যজনক তবু সত্য যে, পল্লী উন্নয়নের জন্য বিকেন্দ্রীকরণের অত্যন্ত দুঃসাধ্য প্রক্রিয়া খুব জরুরী বিষয়।[২০] যাহোক, কর্মের জটিলতা এবং বিপুলতা নিষ্ক্রিয়তার ওজর হওয়া উচিত নয়। পল্লী উন্নয়নের সকল কর্মীরই আদর্শ হওয়া উচিত মার্ক্সের সমাধিতে উৎকীর্ণ সেই বাণী ঃ

"এতদ্‌পর্যন্ত দার্শনিকগণ বিভিন্নভাবে শুধুমাত্র পৃথিবীকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই করেছেন, যদিও মূল করণীয় হচ্ছে এর পরিবর্তন সাধন।"

তথ্যপঞ্জী

১। জেফারসনের বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কিত মতবাদের ব্যাপারে দেখুন, Hannah Arendt, *On Revolution* (New York : The Viking Press, 1965), পৃঃ-২৫-২৫৭।

২। ILO, *Poverty and Landlessness in Rural Asia* (Geneva : ILO, 1977), পৃঃ-১৪৭।

৩। Q.K. Ahmed and M. Hossain, "An Evaluation of selected policies and programmes for the Alleviation of Rural Poverty in Bangladesh, *Strategies for Alleviating Poverty in Rural Asia*, *ed*. R. Islam (Dhaka and Geneva : BIDS and ILO 1985), পৃঃ-৭০।

৪। S.R. Osmani, *Economic Inequality and Group Welfare* (Oxford Clarendon Press, 1982), পৃঃ-১২৬।

৫। Bangladesh Bureau of Statistics, *Report of the Bangladesh Household Expenditure Survey*, 1981-82 (Dhaka : BBS, 1986), পৃঃ-৪৩।

৬। World Bank, "Bangladesh : Selected Issues in Rural Employment" (World Bank Report No. 4292-BD, 1983), (mimeo), পৃঃ-৪।

৭। Michael Lipton, "Poverty Undernutrition and Hunger" (World Bank Staff Working paper No. 597, 1983), (mimeo), পৃঃ-৩৮।

৮। World Bank, Bangladesh : "Economic and Social Development Prospects" (World Bank Report No. 5409, 1985), পৃঃ-৬১।

৯। Betsy Hartmann and James Boyce, *A Quiet Violence* (Delhi : Oxford University Press, 1983), পৃঃ-৮২।

১০। World Bank "Bangladesh Food and Nutrition Sector Review" (World Bank Report No. 4974-BD, 1985), পৃঃ-১২।

১১। BRAC, *The Net Power Structure in Ten Villages* (Dhaka : BRAC, 1983)

১২। Robert Chambers, *Rural Development : Putting the Last First* (London : Longman, 1983), পৃঃ-১৩৩-১৩৪।

১৩। Jenneke Arens and Jos Van Beurden, *Jagrapur : Poor Peasants and Women in Bangladesh*, (Birmingham : Third World Publications, 1977), পৃঃ-১৫৪।

১৪। Hartmann and Boyce, পূর্বোক্ত, পৃঃ-২৮২।

১৫। International Commission of Jurists and Human Rights Institute, *Rural Development and Human Rights in South Asia*, (Lucknow : Human Rights Institute, 1984), পৃঃ-৩৮-৩৯।

১৬। Gunnar Myrdal, *The Challenge of World Poverty*, (New York : Vintage Books, 1970)

১৭। Michael Kalecki, "Social and Economic Aspects of Intermediate Regimes" in *Selected Essays in the Economic Growth of the Socialist and Mixed Economy*, (Cambridge University Press, 1972).

১৮। নীহার রঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস (কলিকাতা লেখক সমবায় সমিতি, ১৩৮বাং), উদ্ধৃতি,পৃঃ-২০০।

১৯। ঐ, পৃঃ-২০০।

২০। Akhtar Hamid Khan, *The Works of Akhtar Hamid Khan* (Comilla : BARD, 1983) Vol. II, পৃঃ-৫০।

২১। ঐ, পৃঃ-৫২।

২২। ঐ, পৃঃ-৬২–৬৩।

২৩। ঐ, পৃঃ-১২৭।

২৪। ঐ, পৃঃ-৯৯।

২৫। ঐ, পৃঃ-১২২–১২৩।

২৬। ঐ, পৃঃ-৫১।

২৭। ঐ, পৃঃ-১৪৮।

২৮। ঐ, পৃঃ-১১২।

২৯। Harry W. Blair, "The Elusiveness of Equity : International Approaches to Rural Development in Bangladesh (Cornell University : Rural Development Committee, 1974), (mimeo), পৃঃ-১৮–২০।

৩০। Azizur Rahman Khan "The Comilla Model and the Integrated Rural Development Programme of Bangladesh : An Experiment in Cooperative Capitalism," *Agrarian Systems and Rural Development*, ed. Dharam Ghai, *et al* (London and Basingstoke: The Macmillan Press Ltd., 1979), পৃঃ-১২০।

৩১। Blair, পূর্বোক্ত, পৃঃ-১৯।

৩২। Abu Abdullah, M. Hossain and R. Nations, "Issues in Agrarian Development and the IRDP" in SIDA/ILO. Report on IRDP, Dhaka, June 1974 (mimeo), পৃঃ-১৬৪।

৩৩। Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperative, Government of the Peoples' Republic of Bangladesh, *Bangladesh Integrated Rural Development Programme : A Joint Review by Government and the World Bank* (Dhaka, October, 1981), পৃঃ-৬৩।

৩৪। Akhtar Hamid Khan, পূর্বোক্ত, পৃঃ-১৫১।

৩৫। Geof Wood, "Rural Development in Bangladesh : Whose Framework ? *The Journal of Social Studies*, Vol. 8, 1980, পৃঃ-১–২৯।

৩৬। Centre for Development Science, "Rural Development in a Cooperative Framework, (An Evaluation of RD-I project in Bangladesh (mimeo), (Dhaka : BRDB, 1983), পৃঃ ৩·১–৩·৫।

৩৭। David C. Korten, "Rural Development Programming : The Learning Process Approach." *"People Centred Development,"* ed. David C. Korten and Rudi Klauss (West Hartford : Kimarion Press, 1984), পৃঃ-১৮১।

৩৮। Government of the Peoples' Republic of Bangladesh, *The Third Five Year Plan*, 1985-90 (Dhaka : Planning Commission, 1985), পৃঃ-২১১।

৩৯। Abdullah, *et al*, পূর্বোক্ত, পৃঃ-১৯৭।

৪০। Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives, পূর্বোক্ত পৃঃ-৩৮

৪১। Centre for Development Studies, পূর্বোক্ত পৃঃ-৯।

৪২। A.R. Khan, পূর্বোক্ত, পৃঃ-১৪৪।

৪৩। A.H. Khan, পূর্বোক্ত, পৃঃ-১৯৭।

৪৪। Centre for Development Studies, পূর্বোক্ত, পৃঃ-৬৩।

৪৫। Jayanta Kumar Roy, *Organizing Villagers for Self Reliance* (Comilla: BARD, 1983), পৃঃ—৪।

৪৬। ঐ, পৃঃ-৯৩।

৪৭। Mahbub Hossain, *Credit for the Rural Poor* (Dhaka: BIDS, 1984), পৃঃ-১২৪-১৩৩।

৪৮। ঐ, পৃঃ-১২৮।

৪৯। World Bank, Bangladesh Selected Issues in Rural Employment (World Bank Report No. 4292-BD, 1983), (mimeo), পৃঃ-৯৬।

৫০। Government of the People's Republic of Bangladesh, "Report of the Committee for Administrative Reorganization/Reform, 1982" (mimeo), পৃঃ-১৩৮।

৫১। ঐ, পৃঃ-১৩৬।

৫২। Mahbub Hossain, Raisul Awal Mahmood and Qazi Khaliquzzaman Ahmed, "Participatory Development Efforts in Rural Bangladeshs. A Case Study of experience: in three areas" *Studies in Rural Participation*, ed. Amit Bhaduri and Md. Anisur Rahman (Delhi: Oxford and IBH Publishing Co. 1982), পৃঃ-৯০-১২০।

৫৩। Government of the Peoples' Republic of Bangladesh, "Report of the Committee for Administrative Reorganization/Reform" (mimeo), পৃঃ-১৩৯।

৫৪। Shaikh Maqsood Ali, M. Safiur Rahman and Kshanada Mohan Das, *Decentralization and Peoples' Participation in Bangladesh*, (Dhaka : NIPA, 1983), পৃঃ-১৫০-৩২২।

৫৫। World Bank, Bangladesh : Economic Trends and Development Administration (World Bank Report No. 4822, 1984), vol. I. পৃঃ-১৩৩।

৫৬। G. Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli, *Implementing Decentralization Programme in Asia* (Nagoya : UNCRD, 1983), পৃঃ-১০১।

৫৭। Robert Chambers, পূর্বোক্ত, পৃঃ-১৩১।

৫৮। Atiur Rahman, *Rural Power Structure* (Dhaka : Bangladesh Books International, 1981), পৃঃ-২৭-৩০।

৫৯। Rehman Sobhan, *Basic Democracies, Works Programme and Rural Development in East Pakistan* (Dhaka : Dhaka University, 1968), পৃঃ-২৩৮।

৬০। D.S. Yusuf Hyder, *Development the Upazila Way* (Dhaka : Dhaka Prokashan, 1986), পৃঃ-১৫৯।

৬১। Akbar Ali Khan, "Conflict and Coordination Problems in Upazila Administration : A Note," *The Young Economist*, BYEA Journal, 1986, পৃঃ-১৬-৩০।

৬২। B.C. Smith, *Decentralization* (London : George Allen and Unwin, 1985), পৃঃ-১৬১।

৬৩। World Bank, *World Development Report* 1985 (New York : Oxford University Press, 1985), পৃঃ-৯৬।

৬৪। External Resources Division, Government of the Peoples' Republic of Bangladesh, *Annual Report*, 1984-85 (Dhaka : ERD 1986), পৃঃ-৫৮।

৬৫। FRM Hasan, "Processes in Landless Mobilization in Bangladesh Theory and Practice" (Dhaka : BIDS, 1985), পৃঃ-৯২।

৬৬। ঐ, পৃঃ-১০২।

৬৭। Proshika Manobik Unnayan Kendra, *Combating Rural Underdevelopment*, (Dhaka : Proshika, 1983), পৃঃ-৮০-৮৪।

৬৮। F.H. Abed, Rahat Uddin Ahmed, Wit. Treygo, "NGO Efforts and Plans : Development as an Experimental Process" *in Focus on 50 Million Poverty in Bangladesh*, ed. K.S. Huda *et al* (Dhaka : ADAB, 1984) পৃ:-৩০।

৬৯। FRM Hasan, পূর্বোক্ত, পৃঃ -১২৯-১৪৩।

৭০। A.Z.M. Obaidullah Khan, *Rural Development in South Asia* (Dhaka : Centre for Development Research, 1983), পৃঃ-২।

৭১। World Bank, *The Assault on World Poverty* (Baltimore : Johns Hopkins, 1975), পৃঃ-৯০-৯৮।

৭২। Dennis A. Rondinelli, Government Decentralization in Comparative Perspective : Theory and Practice in Developing Countries, *International Review of Administrative Science*, Vol. XLVII, 1981 No. 2. পৃঃ-১৩৫-১৩৬।

৭৩। H. Arendt, পূর্বোক্ত, পৃঃ-২৫২।

৭৪। Raj Krishna, "Concepts and Policies of Rural Development," *Rural Development in Asia and the Pacific* (Manila : ADAB, 1985), পৃঃ-৩৮।

৭৫। Diana Conyers, "Decentralization : A Framework for Discussion," *Decentralization, Local Government Institutions and Resource Mobilization*, ed. Hasnat A. Hye Comilla : BARD, 1985), পৃঃ-৩৬।

৭৬। Rondinelli, পূর্বোক্ত, পৃঃ-১৩৬।

৭৭। G. Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli, পূর্বোক্ত, পৃঃ-১০০।

৭৮। Naomi Caiden and Asron Wildavsky, Planning and Budgeting in Poor Countries. (New York : John Wiely, 1974), পৃঃ-৮২।

৭৯। Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed* (Hammondswork : Penguin Books, 1972).

৮০। ঘটনা সমীক্ষার জন্য দেখুন, M. Hossain "Conscietizing Rural Disadvantaged Peasants in Bangladesh : Intervention Through Group Action—A Case Study of Proshika," *Poverty, Productivity and Participation : An Analysis of Some Recent Asian Experiences* (Bangkok : ESCAP, 1982), পৃঃ-১৭-৩৪ এবং Md. Anisur Rahman, "Theory and Practice of Participatory Action Research" (ILO Working papper, August 1983), (mimeo).

৮১। Peter J. Berger and Richard John Neuhaus, "To Empower People Central Development, পূর্বোক্ত, পৃঃ-১৫০।

৮২। Keith Griffin, "Rural Poverty in Asia : Analysis and Policy Alternatives" *Strategies for Al-Leviating Poverty in Rural Asia,* পূর্বোক্ত, পৃঃ-৪২।

৮৩। D.C. Korten, "People-Centred Development : Toward a Frameowrk," *People Centred Development,* পূর্বোক্ত, পৃঃ-৩০৩।

৮৪। H.W.Blair, পূর্বোক্ত, পৃঃ-২৭।

৮৫। FRM Hasan, পূর্বোক্ত, পৃঃ-১৫২।

৮৬। ঐ, পূর্বোক্ত, পৃঃ-১৫০।

৮৭। সরকারী কর্মসূচীর সাথে জিকে-র তুলনামূলক আলোচনার জন্য দেখুন, কামরুল হাসান, "কালিয়াকৈর স্বাস্থ্য কমপেলক্স ও সাভার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের একটি তুলনামূলক আলোচনা।" কোটা বুলেটিন, নং ৩, ১৯৮১ পৃঃ-৪৫-৫৮।

৮৮। কামরুল হাসান, পূর্বোক্ত, পৃঃ-১৬৫।

৮৯। B.S. Khanna, "Aarticipation of Non Governmental Organizations (NGOs) in Integrated Rural Development : An Overview" (Dhaka : CIRDAP, 1984), (mimeo), পৃঃ-৫৫।

৯০। Obaidullah Khan, পূর্বোক্ত পৃঃ-৬৪।

পুস্তক সমালোচনা

বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যা ঃ বর্তমান উন্নয়ন ধারার সংকট এবং বিকল্প পথের প্রশ্ন---নজরুল ইসলাম, প্রকাশক ঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, মার্চ ১৯৮৭। ২০২ পৃষ্ঠা। মূল্য ঃ শোভন---৮০ টাকা, সুলভ---৫০ টাকা।

বইটি লেখকের দীর্ঘদিনের গবেষণার ফসল। ফলে গবেষণাধর্মী করেই পুস্তকখানি প্রণীত। সেজন্য বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যার উপর লিখিত পুস্তক-টিতে উন্নয়ন সম্পর্কে পাঠকদের কোনরূপ ধারণা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা লেখক অনুভব করেন নাই। বর্তমান বিশ্বে 'উন্নয়ন" শব্দটি যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সেজন্য উন্নয়ন বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করলে সম্ভবতঃ বইটির সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পেতো। উন্নয়নের সংজ্ঞা বহুবিধ। কেউ বলেন উন্নয়ন হচ্ছে পরিবর্তন। আবার কারো মতে এটা বস্তর প্রবৃদ্ধি। আবার কারো মতে একই সাথে পরিবর্তন এবং প্রবৃদ্ধি। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে উন্নয়ন বলতে জনগণের মধ্যে স্থিতিশীল ক্রয়ক্ষমতা বোঝায়। যেহেতু উন্নয়নকে এককভাবে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয় সেহেতু এখানে আমরা বিষয়টিকে আরো সহজ করার জন্য বর্তমান কালের সর্বাধিক প্রচলিত কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করছি। সুপ্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিধ স্নাইডার এর ভাষায় "অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে মাথাপিছু উৎপাদন ক্ষমতার দীর্ঘমেয়াদী বা অপ্রতিহত বৃদ্ধিকে বোঝায়।" অধ্যাপক মায়ার ও বল্ডউইন বলেন, "যে পদ্ধতির মাধ্যমে দীর্ঘকালে প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে।" উপরোক্ত সংজ্ঞা ক'টিকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে লক্ষ্য করবো যে, সংজ্ঞা ক'টিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ঃ

১। জাতীয় আয় বৃদ্ধি ; ২। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ; ৩। উৎপাদন বৃদ্ধি ; ৪। জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি ; ৫। জনসেবার মান বৃদ্ধি ও ৬। সম্পদের যথাযথ বন্টন ও ব্যবহার। এই ক'টি দিকের ইংগিত পাই আমরা চার্লস পি কিণ্ডেলবার্গার প্রদত্ত সংজ্ঞায়। তিনি উন্নয়নকে একটু ব্যাখ্যা করে বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, "কোন দেশের উন্নয়ন বলতে একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া বোঝায়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেই দেশের নিম্ন আয় মানুষের বৈষয়িক কল্যাণ সাধিত হবে, দারিদ্রমোচন, নিরক্ষরতা দূর ও শিশুমৃত্যু রোধ হবে এবং অপুষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাবে তারা। বেকারত্ব মোচন হবে এবং কৃষি থেকে দেশ আস্তে আস্তে শিল্পায়নের দিকে এগিয়ে যাবে এবং এইসব লক্ষ্যার্জনের মাধ্যমে নিজেদের

জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও দেশগড়ার কাজে আপামর মানুষের মনঃস্তাত্ত্বিক সমর্থন ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ থাকবে।" যেহেতু জনসাধারণের অংশ গ্রহণ ছাড়া অর্থনৈতিক কোন কর্মই সম্পাদন সম্ভব নয় সেজন্য উন্নয়ন শব্দটি বিশ্লেষণের সময় অর্থনৈতিক উপকরণাদি আলোচনার সাথে সাথে মনঃস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক উপকরণসমূহও ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। সেজন্যই মায়ার এবং বল্ডউইন বলেছেন, "অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক উপকরণই যথেষ্ট নয় বরং সামাজিক, মনঃস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক উপকরণের উপর ওরা নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন জনগণের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় ও উন্নয়নের প্রতি গভীর আগ্রহ। জনগণ যদি অদৃষ্টবাদী হয় এবং উন্নয়নের প্রতি উদাসীন থাকে তাহলে কোন দেশেই উন্নয়ন সম্ভব নয়। যে কোন দেশের উন্নয়নের সাথে নিম্নের এই উপাদানগুলো ওৎপ্রোতভাবে জড়িত ঃ ১। দক্ষ জনশক্তি; ২। জনগণের দৃষ্টিভংগী; ৩। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ; ৪। শক্তিশালী অর্থনৈতিক বুনিয়াদ, যেমন-যোগাযোগ, শক্তি, শিল্প ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি; ৫। শিক্ষা বিস্তার; ৬। মূলধন গঠন; ৭। দক্ষ উদ্যোক্তা সৃষ্টি; ৮। জাতীয় নেতৃবৃন্দের ইতিবাচক ভূমিকা; ৯। জনসংযোগ নিয়ন্ত্রণ ও ১০। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা।

স্বাভাবিকভাবে এই উপাদানগুলো অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়। এগুলোর ইতিবাচক বাস্তবায়নের জন্য দরকার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও নিরলস প্রচেষ্টার।

পরিকল্পনা হচ্ছে উন্নয়নের লক্ষ্যে কতিপয় নীতি ও কর্মসূচীর একটি সমন্বিত প্রচেষ্টা। আরো সহজ ভাষায় বললে পরিকল্পনা হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রাপ্য সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন ও সর্বাধিক ব্যবহারের মাধ্যমে কতিপয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমন্বিত কর্মকাণ্ডের একটা খসড়া দলিল। পরিকল্পনার একটি প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়নের পথে অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত করা এবং সেগুলো দূর করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থার প্রস্তাব করা।

১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকেই বাংলাদেশে অনুসৃত হচ্ছে পরিকল্পিত উন্নয়নের বিভিন্ন পদ্ধতি। সেই লক্ষ্যে স্বাধীনতার পর পরই গঠিত হয়েছিল শক্তিশালী পরিকল্পনা কমিশন। পরবর্তী কালে ১৯৮০ সালে দেশে চালু হয় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। বর্তমানে ১৯৮৫-৯০ সালের জন্য চলছে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। আর এইসব পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আপাতভাবে প্রতি বৎসরই প্রণীত হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (এডিপি)। প্রতি বছর এই সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন মৌল কৌশলও গৃহীত হয়ে থাকে। কিন্তু এই সকল পরিকল্পনার বেশ কিছু মুখ্য লক্ষ্যমাত্রা অবাস্তবায়িত থেকে যায়। অবশ্য এর পেছনে রয়েছে বহুবিধ সমস্যা।

নজরুল ইসলাম "বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যা" পুস্তকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের তথা উন্নয়নের মৌলসমস্যাসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছেন। দুইভাগে বিভক্ত বইটিতে সর্বমোট দশটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। এছাড়া

প্রারম্ভেই রয়েছে গোড়া থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্বলিত একটি সুদীর্ঘ ভূমিকা। পুস্তকখানা লেখকের কয়েক বছরের গবেষণার ফসল যার প্রথম অংশটি বছর দুই আগে "বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশল" নামে আত্মপ্রকাশ করেছিল। দ্বিতীয় অংশটি সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধাকারে উপস্থাপিত হয়েছে। বইখানা এ দুই এর পরিমার্জিত সংস্করণের ফল।

বাংলাদেশের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে গিয়ে লেখক এই পুস্তকে যে কথা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলতে চেয়েছেন তাহলো স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত যে তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচিত হয়েছে এবং সেগুলোতে উন্নয়নের যে সকল লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে এর কোনটিরই পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয়নি। যেমন-লেখকের ভাষায় "১৯৮৪-৮৫ সাল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসর। বলা বাহুল্য এই পরিকল্পনার বেশ কিছু মুখ্য লক্ষ্যমাত্রা অবাস্তবায়িত থেকে যাবে। কৃষি উৎপাদনের হার ৫% বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার স্থলে ৩.৬%, শিল্পোৎ-পাদন ৮.৪% এর স্থলে হবে ৪.৩%; জাতীয় আয় প্রবৃদ্ধির হার গড়ে দাড়াবে ৩.৮ অথচ লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫.৪% জাতীয় আয়ের অনুপাত হিসেবে কর আদায়ের পরিমাণ হবে মাত্র শতকরা ৮.৩%, যেখানে লক্ষ্যমাত্রা ছিলো শতকরা ৯.৫ ভাগ, খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ১৭৫ লক্ষ টন, আর প্রকৃত উৎপাদন হবে ১৫৮ লক্ষ টন; পাটের উৎপাদন গড়ে লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ২৫ ভাগ পেছনে থাকবে; রপ্তানী আয় বৃদ্ধি পাবে শতকরা ৭ ভাগের কাছাকাছি-যেখানে লক্ষ্যমাত্রা ছিল শতকরা ৮.৬ ভাগ। পরিবার পরিকল্পনার মুখ্যসূচক (সিপিআর) লক্ষ্যমাত্রার এক তৃতীয়াংশ নিম্নে থাকবে এবং সর্বোপরি প্রকল্প এবং পণ্য সাহায্য প্রাপ্তির পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রা হতে শতকরা ১.৬ ভাগ কম হবে"। লেখক অবশ্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কোন দিকের উপরই আলোকপাত করেন নাই।

উন্নয়ন অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা করতে গিয়ে লেখক সুদূর '৭১ সাল থেকে '৮৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বৃদ্ধির তুলনামূলক হার, কৃষি উৎপাদনের গতি ও অন্যান্য দিক তথ্যভিত্তিক সারনীর সাহায্যে বেশ চমৎকারভাবে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। বিশ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন, "১৯৭৫-৭৬ সালের পর থেকে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার অনেকের নিকট বেশ সন্তোষজনক মনে হতে পারে ঃ কিন্তু একই সময়ে জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং অন্যান্য ফসল উৎপাদন হ্রাসের পটভূমিতে মোটেও সন্তোষজনক নয়।" এরূপভাবে মৎস্য উৎপাদন, সার ব্যবহার, কৃষি যন্ত্র সরবরাহ, শিল্প ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লেখক বর্তমান উন্নয়ন ধারার মৌলদিক নির্দেশ করতে গিয়ে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। গ্রামে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সম্পদ বৃদ্ধি করা হচ্ছে মূলতঃ ধনী ও অবস্থাশালীদের জন্য। গরীবদের অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে তেমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়না। আর সকল প্রকার উন্নয়নের জন্য অর্থনীতিতে বৈদেশিক সাহায্য এক বিশেষ স্থান দখল

করে আছে। এছাড়া আভ্যন্তরীন সূত্রে সঞ্চয়ের পরিমাণ খুবই কম। উন্নয়ন বাজেটের শতকরা ৮০ ভাগের বেশী দেখানো হয় বৈদেশিক সাহায্য থেকে। বিভিন্ন কারণে লোকদের শহর অভিমুখে গমন, সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ নির্ভরতাও আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবনতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

বর্তমান উন্নয়ন ধারার সংকটের রূপগুলো লেখক নির্দেশ করেছেন পুস্তকের তৃতীয় পরিচ্ছেদে। বস্তুগত উৎপাদন বৃদ্ধির অপ্রতুলতা, অর্থনৈতিক বৈষম্যবৃদ্ধি, দারিদ্র সৃষ্টি, পুষ্টির অভাব, মূল্যবোধের অবক্ষয়, বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রার গতি প্রকৃতি ও বিনিময় হার সংক্রান্ত পরিস্থিতি, উন্নয়ন মডেল হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়াকে গ্রহণের যৌক্তিকতা, ইত্যাদি। অর্থনীতির এসকল ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত, সমস্যাবলী চিহ্নিতকরণ ও বৈশিষ্ট্য আলোচনার মধ্য দিয়েই পুস্তকের প্রথম অংশের যবনিকা।

দ্বিতীয় অংশ "বিকল্প পথের প্রশ্ন" মূলতঃ প্রথমভাগে বর্ণিত সমস্যাবলীর সমাধানসূচক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রথম অংশের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেশের অর্থনীতির যে সকল মৌল বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে এই অংশে যুক্তি সহকারে তার বিপরীত কার্যক্রম গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। যেমন ঃ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ধনিক অভিমুখী অর্থনীতি ও এর ক্ষয়ক্ষতির দিক তুলে ধরা হয়েছে কিন্তু চতুর্থ পরিচ্ছেদে ধনিক অভিমুখী অর্থনীতি ত্যাগ করে গরীব অভিমুখী হওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। তেমনিভাবে, বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস, দারিদ্রের কষাঘাতে গ্রামের লোক যাতে শহরে না আসে সেজন্য গ্রামোন্নয়নের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া ইত্যাদি কৌশলের কথা যুক্তি সহকারে বিবৃত হয়েছে।

"পুনর্গঠিত গ্রামের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা" শীর্ষক পঞ্চম পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিকল্প ধারার উন্নয়নের ক্ষেত্রে গ্রামীন জীবনের পুনর্গঠনের বিষয়টিকে একটি কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে রূপদান করার চেষ্টা করেছেন লেখক। দেশের মূল যে সম্পদ অর্থাৎ বিশাল জনশক্তি তার সার্থক ব্যবহারের মাধ্যমেই গ্রামের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে চাংগা করে তোলা সম্ভব। গ্রামের মানুষের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা সৃষ্টির মাধ্যমেই সম্ভব স্থায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

"গ্রামের পুনর্গঠন এবং জমি মালিকানা" শীর্ষক দীর্ঘ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে লেখক মার্কসীয় ধারায় ভূমি সংস্কারের সুপারিশ করেছেন। সুষ্ঠু গ্রাম পরিচালনার লক্ষ্যে লেখক যৌথতাভিত্তিক প্রশাসন ব্যবস্থার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তবে এই কর্তৃত্ব ও প্রশাসনকে হতে হবে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক। গ্রামবাসীদের সাধারণ সভাই হবে সকল ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকারী। দুই সাধারণ সভার অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য এবং অর্থনীতির দৈনন্দিন পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য গ্রামভিত্তিক একটি পরিচালনা কাঠামোও গঠন করার সুপারিশ করেছেন লেখক পুস্তকের সপ্তম অধ্যায়ে। এই সুপারিশ লেখক চীনের অভিজ্ঞ-

তার আলোকেই করেছেন। মার্কসীয় ধারায় ভূমি সংস্কারের সুপারিশ করলেও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর সমস্যাসমূহ লেখক স্বীকার করেন নাই। জমি মালিকানার বিষয়ে যৌথতার যে সুপারিশ লেখক করেছেন তার সম্ভাব্যতাও যাচাই করা প্রয়োজন। বিশেষ করে তৃতীয় পরিচ্ছেদে কোরিয়াকে উন্নয়ন মডেল হিসেবে গ্রহণ করার বিপক্ষে লেখক যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেছেন এবং চৈনিক মডেলে গ্রামীন পুর্ণগঠনের যে কথা বলেছেন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সেটি কার্যকর করার সময় এসেছে বলে মনে হয় না। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা উন্নয়নের পূর্ব শর্ত, এ কথাটি সর্বদাই আমাদের মনে রাখতে হবে। উন্নয়নের রাজনৈতিক ও মনঃস্তাত্বিক দিকগুলোর কথা ভুললে চলবেনা।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প ও শিল্পায়নের ভূমিকা অনন্য। যেহেতু কৃষির মাধ্যমেই ক্রমবর্ধমান জনশক্তির সবটার সার্থক নিয়োজন সম্ভব নয় সেকারণে প্রয়োজন হবে পুণর্গঠিত গ্রামের কেন্দ্রীভূত সর্বস্তরের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধারায় শিল্প প্রসারের।

লেখক শহরকেন্দ্রিক বৃহৎ শিল্পের চেয়ে গ্রামীন কুটির শিল্পের উপর জোর দিয়েছেন বেশী। একটি কথা লেখক অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলতে চেয়েছেন তাহলো শিল্প স্থাপনের কৌশলকে দেশের সামগ্রীক উন্নয়ন কৌশলের সাথে একীভূত হতে হবে এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। শিল্পোন্নয়নের জন্য মুক্ত বাণিজ্যনীতির প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে বেশ জোরের সাথে। উৎপাদন মিশ্রণের দৃষ্টিকোণ থেকে এই শিল্প বিকাশের আশু লক্ষ্য হবে মৌলিক চাহিদামূলক গণ ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন, অন্যদিকে ভোগ্যপণ্যের পাশাপাশি দেশের সম্ভাবনা অনুযায়ী বিভিন্ন মধ্যবর্তী পুঁজিমূলক দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধিও হবে এর লক্ষ্য।

নবম পরিচ্ছেদে লেখক 'উন্নয়নে ব্যক্তি খাতের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনায় একদিকে যেমন শিল্পে ব্যক্তি মালিকানার উপর জোর দিয়েছেন অন্যদিকে ব্যক্তি মালি-কানার নামে শ্রেণী বা গোষ্ঠী যাতে গড়ে না ওঠে সে ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। এই লক্ষ্যে লেখক ব্যাংক ও বৃহদাকার শিল্প কারখানা ব্যক্তি মালিকানায় না দেয়ার সুপারিশ করেছেন। বরং রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের সৎ ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

দশম এবং শেষ অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে বৈদেশিক সাহায্যের প্রসংগটি। বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলতঃ বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর একথা লেখক প্রথমেই উল্লেখ করেছেন। বৈদেশিক সাহায্যের সাধারণতঃ তিনটি লক্ষ্য লেখক চিহ্নিত করেছেনঃ (ক) ভূ-রাজনৈতিক; (খ) বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক এবং (গ) মানবিক। যেহেতু বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া আমাদের চলা সম্ভব নয় তাই লেখক মানবিক সাহায্য গ্রহণের পক্ষপাতি। ভূ-রাজনৈতিক উপাদান রয়েছে এমন সাহায্য পারত-পক্ষে না গ্রহণ করাই শ্রেয়। বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার প্রসংগে লেখকের পরামর্শ হচ্ছে সাহায্যের সর্বোচ্চ দক্ষ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং দক্ষিণ দক্ষিণ সাহায্য বৃদ্ধি করা। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধিও লেখকের অন্যতম পরামর্শ।

তার আলোকেই করেছেন। মার্কসীয় ধারায় ভূমি সংস্কারের সুপারিশ করলেও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর সমস্যাসমূহ লেখক স্বীকার করেন নাই। জমি মালিকানার বিষয়ে যৌথতার যে সুপারিশ লেখক করেছেন তার সম্ভাব্যতাও যাচাই করা প্রয়োজন। বিশেষ করে তৃতীয় পরিচ্ছেদে কোরিয়াকে উন্নয়ন মডেল হিসেবে গ্রহণ করার বিপক্ষে লেখক যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেছেন এবং চৈনিক মডেলে গ্রামীন পূর্ণগঠনের যে কথা বলেছেন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সেটি কার্যকর করার সময় এসেছে বলে মনে হয় না। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা উন্নয়নের পূর্ব শর্ত, এ কথাটি সর্বদাই আমাদের মনে রাখতে হবে। উন্নয়নের রাজনৈতিক ও মনঃস্তাত্বিক দিকগুলোর কথা ভুললে চলবেনা।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প ও শিল্পায়নের ভূমিকা অনন্য। যেহেতু কৃষির মাধ্যমেই ক্রমবর্ধমান জনশক্তির সবটার সার্থক নিয়োজন সম্ভব নয় সেকারণে প্রয়োজন হবে পূর্ণগঠিত গ্রামের কেন্দ্রীভূত সর্বস্তরের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধারায় শিল্প প্রসারের।

লেখক শহরকেন্দ্রিক বৃহৎ শিল্পের চেয়ে গ্রামীন কুটির শিল্পের উপর জোর দিয়েছেন বেশী। একটি কথা লেখক অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলতে চেয়েছেন তাহলো শিল্প স্থাপনের কৌশলকে দেশের সামগ্রীক উন্নয়ন কৌশলের সাথে একীভূত হতে হবে এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। শিল্পোন্নয়নের জন্য মুক্ত বাণিজ্যনীতির প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে বেশ জোরের সাথে। উৎপাদন মিশ্রণের দৃষ্টিকোণ থেকে এই শিল্প বিকাশের আশু লক্ষ্য হবে মৌলিক চাহিদামূলক গণ ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন, অন্যদিকে ভোগ্যপণ্যের পাশাপাশি দেশের সম্ভাবনা অনুযায়ী বিভিন্ন মধ্যবর্তী পুঁজিমূলক দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধিও হবে এর লক্ষ্য।

নবম পরিচ্ছেদে লেখক 'উন্নয়নে ব্যক্তি খাতের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনায় একদিকে যেমন শিল্পে ব্যক্তি মালিকানার উপর জোর দিয়েছেন অন্যদিকে ব্যক্তি মালি-কানার নামে শ্রেণী বা গোষ্ঠী যাতে গড়ে না ওঠে সে ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। এই লক্ষ্যে লেখক ব্যাংক ও বৃহদাকার শিল্প কারখানা ব্যক্তি মালিকানায় না দেয়ার সুপারিশ করেছেন। বরং রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের সৎ ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

দশম এবং শেষ অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে বৈদেশিক সাহায্যের প্রসংগটি। বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলতঃ বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর একথা লেখক প্রথমেই উল্লেখ করেছেন। বৈদেশিক সাহায্যের সাধারণতঃ তিনটি লক্ষ্য লেখক চিহ্নিত করেছেনঃ (ক) ভূ-রাজনৈতিক; (খ) বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক এবং (গ) মানবিক। যেহেতু বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া আমাদের চলা সম্ভব নয় তাই লেখক মানবিক সাহায্য গ্রহণের পক্ষপাতি। ভূ-রাজনৈতিক উপাদান রয়েছে এমন সাহায্য পারত-পক্ষে না গ্রহণ করাই শ্রেয়। বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার প্রসংগে লেখকের পরামর্শ হচ্ছে সাহায্যের সর্বোচ্চ দক্ষ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং দক্ষিণ দক্ষিণ সাহায্য বৃদ্ধি করা। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধিও লেখকের অন্যতম পরামর্শ।

পনের পৃষ্ঠাব্যাপী একটি সমৃদ্ধ পাঠসূচী অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পাঠ ও গবেষণা চাহিদা পূরণে যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়। পাদটীকা ব্যবহার করা হয়েছে যথেষ্ট পরিমাণ। যথেষ্ট পরিমাণে সারণী বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য করে তুলেছে। মুদ্রণ প্রমাদ খুবই কম। নাম নির্ঘন্টের সাথে বিষয় নির্ঘন্ট থাকলে বইটি আরো সমৃদ্ধ হতো।

অর্থনীতির ছাত্র ছাড়াও দেশের প্রতিটি শিক্ষিত ও সচেতন নাগরিকের জন্য বইটি প্রয়োজনীয়।

—আব্দুল মতিন

পলিটিক্স ডেভেলপমেন্ট এণ্ড উপজেলা—ডঃ আ, ম, ম, শওকত আলী, প্রকাশক ঃ ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব লোকাল গভর্ণমেন্ট, ডিসেম্বর ১৯৮৬, মূল্য ঃ ১৭৫ টাকা।

ডঃ আ,এম,এম শওকত আলী রচিত এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভমেন্ট ৪৯, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা কর্তৃক ১৯৮৬ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত "পলিটিক্স, ডেভলপমেন্ট এণ্ড উপজেলা" নামক বইটি ইতিমধ্যেই পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। নামকরণ থেকে বুঝা যায় যে, বইটি সমকালীন বাংলাদেশের তিনটি সবচয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বহু আলোচিত বিষয় নিয়ে লেখা হয়েছে। এমন দিন নেই যে রাজনীতি, উন্নয়ন আর উপজেলা নিয়ে আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকায় পরিবেশিত হচ্ছে না। তবু ডঃ আলী এ তিন বিষয়কেই তাঁর এ বই-এর বিষ হিসেবে বেছে নিয়েছেন। সংবাদ পত্রে পরিবেশিত খবর আর ডঃ আলীর বই-এ বিষয়বস্তর মধ্যে পার্থক্য এই যে, ডঃ আলী একজন উর্ধ্বতন সরকারী কর্মক হিসেবে সরকারের নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে নিজেকে জড়িত রেখে, নির্ভীক চিত্তে তাঁর অভিজ্ঞতার ফসল পাঠককে উপহার দিয়েছেন। অনেক অজানা বিষয়কে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সবার সামনে তুলে ধরে পাঠকের তথা সমাজের মানুষের কৌতূহল সৃষ্টি করেছেন। সাংবাদিকেরাও অনেক তথ্য পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পারেন, তবে ডঃ আলীর মত সরকারের ভিতর থেকে এমন নিগূঢ় তথ্য পরিবেশন করার সুযোগ তাঁদের নেই। এ জন্যই বইটিতে সবার নজর পড়েছে।

এবার বইটির বিষয়বস্তর উপর দৃষ্টি ফেরানো যাক। বইটি আটটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। অধ্যায়গুলো হলো ঃ—

প্রথম অধ্যায় ঃ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের প্রশাসনিক সংস্কার ;
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ প্রশাসনিক সংস্কার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ;
তৃতীয় অধ্যায় ঃ জাতীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং সংস্কারের পথে বিপত্তিসমূহ ;
চতুর্থ অধ্যায় ঃ প্রশাসনিক প্রেক্ষাপটে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ সমূহ ;
পঞ্চম অধ্যায় ঃ পরীক্ষামূলক উপজেলা ঃ উন্নয়নকল্পে কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ ;
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ উপজেলার বাইরে ;
সপ্তম অধ্যায় ঃ উপসংহার।

প্রথম অধ্যায়ঃ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে প্রশাসনিক সংস্কারঃ

শুরুতেই লেখক দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল রাজনৈতিক পদ্ধতির কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, বৃটিশ ঔপনিবেশিক প্রথা হতে মুক্ত হওয়ার ফলে নতুন প্রথার আবির্ভাব তথা জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের লক্ষ্যে সামগ্রিক পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তবে ভারতের মতো দেশে যেখানে স্থায়ী রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু আছে সেখানে স্থানীয় সরকারকে অধিকতর গণতান্ত্রিক করা ছাড়া বিরাট রকমের কোন পরিবর্তন হঠাৎ করে আনা হয়নি। বার্মায় স্থানীয় সরকার পদ্ধতির পরিবর্তনের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। পাকিস্তানে ১৯৪৭ইং সন হ'তে ১৯৭১ইং সন পর্যন্ত অনেক প্রশাসনিক সংস্কার কমিটির সুপারিশ সত্ত্বেও কোন বড় পরিবর্তন আনা হয়নি। তবে বাংলাদেশ যখন পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে পাকিস্তানের অংশ ছিল তখন ১৯৫৮ইং সনে আয়ুব খানের সামরিক সরকার এ দেশে মৌলিক গণতন্ত্র প্রথা চালু করেন এবং জেলা প্রশাসক ও মহকুমা প্রশাসককে যথাক্রমে জেলা ও মহাকুমা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নিয়োগ করার প্রথা চালু করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আওয়ামী লীগ সরকার ও বি,এন,পি সরকার স্থানীয় সরকার পদ্ধতির পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টা চালায়। বইটিতে এ অধ্যায়ে আওয়ামী লীগ আমলে গঠিত চৌধুরী কমিটির বিভিন্ন সুপারিশের কথা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে জেলা প্রশাসন, জেলা পরিষদ ও থানা প্রশাসন সম্পর্কে চৌধুরী কমিটির সুপারিশের উল্লেখযোগ্য দিক সমূহ। তেমনি বি,এন,পি আমলে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কর্তৃক সিনিয়র সার্ভিস পুল, ২৮টি সাব ক্যাডার নিয়ে সিভিল সার্ভিস কাঠামো, থানা উন্নয়ন কমিটি, থানা পরিষদ, গ্রাম সরকার ও ভি,ডি,পি গঠনের কথা সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ কর্তৃক ২৮শে এপ্রিল ১৯৮২ই তারিখ এ্যাডমির্যাল খান কমিটির গঠন ও এ কমিটির সুপারিশ সমূহ আলোচনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন যে, তিনি নিজেই এ কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, এ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে উপজেলা সৃষ্টি করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৯৮২ ইং থেকে ১৯৮৪ইং পর্যন্ত সময়ের প্রশাসনিক সংস্কার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি ১৯৮২ এর সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮২ সনে আগস্ট মাসে সরকার কর্তৃক নিকার (ন্যাশনাল ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি ফর এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্ম) গঠনের কথা।

লেখক উপজেলা সৃষ্টির ব্যাপারে নিকারের পাশাপশি মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের কার্যকরী ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, দ্রুতগতিতে সরকারের আদেশ ও সিদ্ধান্ত সম্বলিত ম্যানুয়াল ও বাস্তবায়ন পদক্ষেপের উপর প্রতিবেদন ইত্যাদি ছেপে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ। বস্তুতঃ মন্ত্রী

পরিষদ বিভাগের কার্যকরী ভূমিকা ছাড়া প্রশাসনিক সংস্কার-এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে দ্রুত গতিতে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এমনকি উপজেলাতে বিভিন্ন কর্মকর্তা নিয়োগের ব্যাপারে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ হস্তক্ষেপ করে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে।

লেখক পর্যায়ক্রমে নতুন জেলা সৃষ্টির জন্য সরকার কর্তৃক বিশেষ কমিটি গঠনের কথা উল্লেখ করেছেন। এই বিশেষ কমিটি জেলা সদরের বাইরের মহকুমাগুলোকে নিম্নরূপ জেলায় রূপান্তর করার সুপারিশ করেন।

১ম শ্রেণী : আট বা অধিক উপজেলা নিয়ে নতুন জেলা গঠন ;
২য় শ্রেণী : পাঁচ হ'তে সাতটি উপজেলা নিয়ে নতুন জেলা গঠন ;
৩য় শ্রেণী : চার বা কম উপজেলা নিয়ে নতুন জেলা গঠন ;
৪র্থ শ্রেণী : বিশেষ শ্রেণীর জেলা যথা : ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও ময়মনসিংহ।

বিশেষ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ও জনগণের দাবীর প্রেক্ষিতে ৪২টি মহকুমাকে জেলায় রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। এর ফলে জেলার মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৪তে। পটিয়া, রামগড়, কাপ্তাই ও লামাকে পরে জেলায় রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপজেলায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের প্রসংগে তিনি বলেন যে প্রথমে চৌদ্দজন কর্মকর্তাকে সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং পরবর্তী সময়ে তা সতেরোতে উন্নীত করা হয়। তিনি উপজেলায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের ঢাকায় দু'দিনের প্রশিক্ষণের কথাও উল্লেখ করেন।

উপজেলা চেয়ারম্যানদের ক্ষমতা ও মর্যাদা প্রদানের ব্যাপারে তিনি বলেন যে, নিকারের সদস্যরা ধরেই নিয়েছিলেন যে ক্ষমতার অপব্যবহার হবে এবং এর প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়েছিল।

(১) সঠিক নেতৃত্বের স্বার্থে উপজেলা চেয়ারম্যানদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনা করা

(২) নির্বাচনের পর তাঁদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ;

(৩) উপজেলা চেয়ারম্যানদের পদ মর্যাদা সংসদ সদস্যদের পদমর্যাদার নিম্নে নির্ধারণ করা।

(৪) নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের মধ্য থেকে একজনকে উপজেলা চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনয়ন করা ;

(৫) ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার জন্য সরকারী কর্মকর্তা ও উপজেলা চেয়ারম্যানদের সমান ক্ষমতা প্রদান করা।

উপজেলা নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত থানা কমিশনার উপজেলা চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করবেন এবং সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে হ'তে থানা কমিশনার নিয়োগ করার বিষয় বিবেচনা করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপজেলা নির্বাহী

অফিসার ও উপজেলার অন্যান্য কর্মকর্তাদের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ১৯৮২ সনের ২৩শে অক্টোবরের সরকারী সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত দ্বারা উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে উপজেলার অন্যান্য কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন লেখার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ ও পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তারা প্রথমে এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। ফলে সরকারকে এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়। তবু নির্বাহী অফিসারগণ উপজেলা চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করায় অন্যান্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মধ্যে চরম অসন্তোষ দেখা যায় এবং উপজেলা নির্বাচনের পর এ অসন্তোষ কিছুটা প্রশমিত হয়।

লেখক জেলা ও উপজেলার মধ্যকার বিদ্যমান সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার মতে সরকার আশা করেন নির্বাচিত জেলা পরিষদ এ সমস্যার সমাধান করতে পারবে। এই প্রসংগে উল্লেখ্য যে উপজেলা পরিষদের সামরিক বাহিনীর অংশ গ্রহণ নিয়ে বিগত সংসদ অধিবেশনে তুমুল বাকবিতণ্ডা হয় এবং সরকার জেলা পরিষদ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত আপাততঃ স্থগিত রেখেছেন।

এ অধ্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও উপজেলার মধ্যকার দায়িত্ব ও রাজস্ব ভাগাভাগি, উপজেলা পরিষদের ট্যাক্স বসানোর ক্ষমতা, প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর ভবিষ্যৎ ভূমিকা, উন্নয়ন প্রকল্পে স্থানীয় লোকজনদের অংশগ্রহণ, উপজেলা উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন, উপজেলা তহবিলের সদ্ব্যবহার ও জবাব দিহির প্রশ্নের উপর বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ জাতীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং সংস্কারের পথে বিপত্তিসমূহঃ

এ অধ্যায়ে লেখক জুন, ১৯৮২ সন থেকে ডিসেম্বর, ১৯৮৪ সন পর্যন্ত জেনারেল এরশাদ-এর সরকারকে যে বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল তার বর্ণনা দিয়েছেন। জেনারেল এরশাদ-এর প্রশাসনিক সংস্কারকে বিরোধী রাজনৈতিক দল সমূহ সন্দেহের চোখে দেখছিলেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে বিরোধী রাজনৈতিক দল সমূহের আশংকা ও সন্দেহের কারণ ছিল দু'টি ঃ

(এক) রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যানগণ একবার স্থলাভিষিক্ত হ'লে তাদের সংসদ ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সহজেই ব্যবহার করা হবে।

(দুই) উন্নয়ন তহবিলের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর সামগ্রিকভাবে নির্ভরশীল উপজেলা চেয়ারম্যানগণ স্বাভাবিকভাবেই সরকারের সাথে হাত মিলাবে এবং স্থানীয় পর্যায়ে তারা জেনারেল এরশাদের শক্তিশালী ক্ষমতার ঘাঁটি হিসেবে কাজ করবে।

জাতীয় ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলসমূহের চরম বিরোধিতা অপর দিকে জেলা সৃষ্টির পদ্ধতির বিরুদ্ধে জনগণের বিকল্প প্রতিক্রিয়া জেনারেল এরশাদ-এর সরকার-কে মোকাবেলা করতে হয়েছিল বলে এ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। জানা যায় সরকারের ধৈর্য আর প্রজ্ঞাই রাজনৈতিক দলসমূহকে মোকাবেলা করতে সহায়তা করেছে। আর উপজেলা ও জেলা সৃষ্টির ব্যাপারে সীমানা নির্ধারণ নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও স্থানীয় জনগণের বিপুল উৎসাহকে সরকার পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছেন। এ প্রসংগে ফেনী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অপ্রীতিকর ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই অপ্রীতিকর ঘটনার বিশদ বর্ণনায় দেখানো হয়েছে জেলা সৃষ্টির দাবী কত তীব্র ছিল। এই ঘটনাগুলো আমাদের জানা। তবু লেখকের নিখুঁত বর্ণনায় এগুলো জ্বলন্ত ইতিহাসে রূপ নিয়েছে।

১৯৮৪ সনে উপজেলা নির্বাচন করার সরকারী প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে রাজনৈতিক দলগুলো সামরিক আইন তুলে নিয়ে সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে দিয়ে রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপর বিধি নিষেধ শিথিল করার জোর দাবী জানাচ্ছিলেন। দলগুলোর দাবী ছিল সংসদ নির্বাচনের আগে কোন নির্বাচন না করা এবং উপজেলার বিষয়টি জাতীয় সংসদ-এর উপর ছেড়ে দেয়া।

রাজনৈতিক দলগুলির ঘেরাও আন্দোলন এবং ট্যাক্স ও রাজস্ব প্রদান না করার অসহযোগ আন্দোলনের হুমকি দেয়। সরকার ৬ই এপ্রিল ১৯৮৫ইং তারিখ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা দেন। কিন্তু রাজনৈতিক দল-সমূহ সামরিক শাসনের অধীনে সংসদ নির্বাচন-এ অংশ নিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় ১লা মার্চ ১৯৮৫ইং তারিখ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এক বেতার ও টেলিভিশন ঘোষণায় সকল রাজনৈতিক কার্যকলাপ তাৎক্ষণিক ভাবে বন্ধ করেন এবং ২১শে মার্চ ১৯৮৫ইং তারিখ রেফারেণ্ডাম এর তারিখ নির্ধারণ করেন।

নির্ধারিত তারিখে রেফারেণ্ডাম অনুষ্ঠিত হয় এবং জেনারেল এরশাদ ৯৪.৪৭% হাঁ সূচক ভোট পান। পরবর্তী পর্যায়ে ১৬ই ও ২০শে মে ১৯৮৫ইং তারিখ উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বাধা বিপত্তি ও সংঘর্ষ সত্ত্বেও এ নির্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষ্য করা যায় এবং ৪৬০টি উপজেলার মধ্যে ২০৭টি উপজেলায় জনদলের প্রার্থীরা জয়ী হয়। আওয়ামী লীগ ও বি,এন,পি প্রকাশ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলেও দেখা যায় তাদের ৫৩জন ও ৩৪জন প্রার্থী যথাক্রমে নির্বাচনে জয়ী হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ প্রশাসনিক প্রেক্ষাপটে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ ঃ

এই অধ্যায়ে সংস্কারমূলক পদক্ষেপের ফলে বিভিন্ন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্ব মেনে নিতে বিশেষজ্ঞ ক্যাডারের সদস্যদের অস্বীকৃতি, উপজেলার কর্মকর্তাদের উপর উপজেলা পরিষদের কর্তৃত্বের ধরণ ও পরিমাণ, উপজেলা কর্মকর্তাদের প্রেষণ, নিয়ন্ত্রণ ও প্রশিক্ষণ

ইত্যাদির উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও কৃষিবিদদের নয় দফা দাবীর কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে এই তিন ক্যাডারের কর্মকর্তারা ২৪ ঘন্টা অবিরাম ধর্মঘট পালন করার হুমকি দেওয়ায় উপজেলা পর্যায়ে এইসব ক্যাডারের সদস্যদের উপর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিয়ন্ত্রণ আদেশ সরকার বাতিল করেন। তবে এইসব ক্যাডারের কতিপয় সিনিয়র সদস্যদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে রাষ্ট্রপতির সাথে আলাপের প্রেক্ষিতে এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়। ইতিমধ্যে সামরিক শাসন পুনরায় জোরদার করা হয়। জেনারেল এরশাদ রেফারেণ্ডামে বিপুল ভোটে জয়ী হন এবং উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ফলে বিশেষজ্ঞ ক্যাডারের সদস্যদের আন্দোলন প্রশমিত হয়। উপজেলা পরিষদের তহবিল নিয়ন্ত্রণ ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানদের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব সম্পর্কেও এ অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ পরীক্ষামূলক উপজেলাঃ কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণঃ

এই অধ্যায়ে স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উন্নয়নে উপজেলা পরিষদের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তিনি উপজেলা পরিষদের কার্যাবলীর তালিকা সংযুক্ত করে মন্তব্য করেন যে, বিচার বিভাগ ছাড়া উপজেলা পরিষদকে স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি, পশুপালন, মৎস্য উন্নয়ন, বন সম্পদ, শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, পরিবার কল্যাণ, সমবায় ও জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি প্রায় সকল প্রকার উন্নয়ন মূলক কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তবে এসব উন্নয়ন মূলক কাজের পরিকল্পনা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, কোন উপজেলা পরিষদের বিশেষ কোন আয় বিশেষ কোন উন্নয়ন মূলক প্রকল্পের জন্য চিহ্নিত করে রাখার আদেশ কেন্দ্রীয় সরকার দিতে পারেন। উপজেলা পরিষদের কার্যাবলীর ব্যাপক তালিকা প্রণয়ন করা হচ্ছে বটে তবে এ সব পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন করা হয়নি। উপজেলা পরিষদও নিজেকে পরিচালনা করার জন্য কোন বিধি প্রণয়ন করেনি যদিও পরিষদকে সরকারী আদেশের সাথে সামঞ্জস্যহীন নয় এমন বিধি প্রণয়ন করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। উপজেলা চেয়ারম্যানের নির্বাহী ক্ষমতার পরিসর খর্ব করার বিধির অভাবটাই উপজেলা পরিষদকে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে বাধা সৃষ্টি করেছে বলে মন্তব্য করা হয়েছে। এ প্রসংগে লেখক কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে সরকারী আদেশ ও নিয়ম সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে অনেক উপজেলা চেয়ারম্যান নিজের খেয়াল খুশিমত প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে ১৯৮৩-৮৫তে ৯৩টি গম আত্মসাতের মামলা উপজেলা চেয়ারম্যানদের বিরুদ্ধে রজু করা হয়। নাচোল উপজেলার ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তিনি দেখিয়ে

ইত্যাদির উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও কৃষিবিদদের নয় দফা দাবীর কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে এই তিন ক্যাডারের কর্মকর্তারা ২৪ ঘন্টা অবিরাম ধর্মঘট পালন করার হুমকি দেওয়ায় উপজেলা পর্যায়ে এইসব ক্যাডারের সদস্যদের উপর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিয়ন্ত্রণ আদেশ সরকার বাতিল করেন। তবে এইসব ক্যাডারের কতিপয় সিনিয়র সদস্যদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে রাষ্ট্রপতির সাথে আলাপের প্রেক্ষিতে এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়। ইতিমধ্যে সামরিক শাসন পুনরায় জোরদার করা হয়। জেনারেল এরশাদ রেফারেণ্ডামে বিপুল ভোটে জয়ী হন এবং উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ফলে বিশেষজ্ঞ ক্যাডারের সদস্যদের আন্দোলন প্রশমিত হয়। উপজেলা পরিষদের তহবিল নিয়ন্ত্রণ ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানদের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব সম্পর্কেও এ অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ পরীক্ষামূলক উপজেলাঃ কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণঃ

এই অধ্যায়ে স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উন্নয়নে উপজেলা পরিষদের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তিনি উপজেলা পরিষদের কার্যাবলীর তালিকা সংযুক্ত করে মন্তব্য করেন যে, বিচার বিভাগ ছাড়া উপজেলা পরিষদকে স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি, পশুপালন, মৎস্য উন্নয়ন, বন সম্পদ, শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, পরিবার কল্যাণ, সমবায় ও জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি প্রায় সকল প্রকার উন্নয়ন মূলক কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তবে এসব উন্নয়ন মূলক কাজের পরিকল্পনা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, কোন উপজেলা পরিষদের বিশেষ কোন আয় বিশেষ কোন উন্নয়ন মূলক প্রকল্পের জন্য চিহ্নিত করে রাখার আদেশ কেন্দ্রীয় সরকার দিতে পারেন। উপজেলা পরিষদের কার্যাবলীর ব্যাপক তালিকা প্রণয়ন করা হচ্ছে বটে তবে এ সব পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন করা হয়নি। উপজেলা পরিষদও নিজেকে পরিচালনা করার জন্য কোন বিধি প্রণয়ন করেনি যদিও পরিষদকে সরকারী আদেশের সাথে সামঞ্জস্যহীন নয় এমন বিধি প্রণয়ন করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। উপজেলা চেয়ারম্যানের নির্বাহী ক্ষমতার পরিসর খর্ব করার বিধির অভাবটাই উপজেলা পরিষদকে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে বাধা সৃষ্টি করেছে বলে মন্তব্য করা হয়েছে। এ প্রসংগে লেখক কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে সরকারী আদেশ ও নিয়ম সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে অনেক উপজেলা চেয়ারম্যান নিজের খেয়াল খুশিমত প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে ১৯৮৩-৮৫তে ৯৩টি গম আত্মসাতের মামলা উপজেলা চেয়ারম্যানদের বিরুদ্ধে রজু করা হয়। নাচোল উপজেলার ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তিনি দেখিয়ে

দিয়েছেন যে বাহুবলে অফিস ঘেরাও করে একজন উপজেলা চেয়ারম্যান তাঁর অপসারনের কার্যক্রমকে কিভাবে বানচাল করে দিতে পারেন।

এ অধ্যায়ের শেষে তিনি পলাশবাড়ী উপজেলা চেয়ারম্যানের অপসারণের নেপথ্য কাহিনী বর্ণনা করেছেন। উক্ত চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অভিযোগের সংখ্যা ছিল ২৩টি যার মধ্যে ক্ষমতার অপব্যবহারও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ উপজেলার বাইরেঃ

পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচনার আলোকে লেখক মন্তব্য করেন যে, স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উপজেলার বাইরের সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন আছে যা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে করা সম্ভব নয়। তিনি মনে করেন মাঠ পর্যায়ের সনাতন প্রশাসন এ দায়িত্ব পালন করতে পারে। তবে তিনি সতর্ক করে দেন যে এ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে গেলে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর আমলাদের আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস চালানো হচ্ছে বলে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা হতে পারে। তিনি এ প্রসংগে বলেন যে উপজেলা পরিষদের অস্তিত্ব সুসংহত করার জন্য সরকারের নির্বাচিত জেলা পরিষদের কথা চিন্তা করেছেন। তবে সবকিছু নির্ভর করে প্রস্তাবিত জেলা পরিষদের ভবিষ্যতের উপর।

উপজেলা থেকে ইউনিয়ন ও গ্রামে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা এ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। ইউনিয়নকে শক্তিশালী করার সাথে সাথে ইউনিয়নের নিম্ন পর্যায়ে গ্রামে জনগণের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দরকার আছে, কারণ বর্তমান ওয়ার্ড প্রথাও গ্রামের সাধারণ মানুষের কল্যাণ বয়ে আনতে পারছেনা। এ প্রসংগে তিনি স্বনির্ভর গ্রাম সরকারের কথাও উল্লেখ করেন এবং স্বনির্ভর প্রথা ব্যর্থ হওয়ার কয়েকটি কারণও তিনি ব্যাখ্যা করেন।

সপ্তম অধ্যায়ঃ উপসংহারঃ

ডঃ আলী শেষ অধ্যায়ে মন্তব্য করেছেন যে তাঁর এ বই লেখার প্রধান উদ্দেশ্য হল দেশের বর্তমান রাজনৈতিক-প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে সবার সামনে তুলে ধরা যা স্থানীয় সরকারের আমুল পরিবর্তন এনেছে। তিনি উল্লেখ করেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ার সময় এখনো আসেনি। কারণ উপজেলা এখনও একটা পরীক্ষা-মূলক প্রতিষ্ঠান এবং সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসেনি। যা হোক বর্তমান পরিস্থিতির উন্নয়ন কল্পে তিনি কয়েকটি সুপারিশ রেখেছেন।

(ক) উপজেলাকে এমন বোঝা চাপানো ঠিক হবে না যা সে বহন করতে পারে না।

(খ) সুদূর কেন্দ্রে বসে সরকারের পক্ষে ৪৬০টি স্বতন্ত্র সমস্যা জর্জরিত উপজেলাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। প্রকল্প সমূহ চিহ্নিতকরণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিশ্চিত করা প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন।

তিনি উপজেলা পরিষদের ব্যাপারে জেলা প্রশাসককে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়ার সুপারিশ করেছেন। উপজেলা পরিষদের হিসাব নিরীক্ষা করার দায়িত্ব কম্পট্রলার এণ্ড অডিটর জেনারেলের। কিন্তু প্রায় দেখা যায় অডিট আপত্তির রিপোর্ট এত দেরীতে পৌঁছে যে এর উপরে আর কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তিনি সুপারিশ করেন যে অডিট আপত্তির রিপোর্ট তড়িৎ গতিতে জেলা প্রশাসকের নিকট পাঠাতে হবে যাতে করে জেলা দুর্নীতি দমন কমিটির সভাপতি হিসাবে জেলা প্রশাসক সময়মত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

উপজেলা চেয়ারম্যান ও সংসদ সদস্যদের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন যে এ ব্যাপারে কোন ধরাবাধা নিয়ম করার প্রয়োজন নেই, কারণ উপজেলার কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে সংসদ সদস্যদের প্রশ্ন তোলার ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

আমলাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেন যে মাত্র দু'বছরের সময়ের মধ্যে ৪৬০টি উপজেলা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এর ফলে অনেক অদক্ষ লোককে চাকুরীতে নিয়োগ করতে হয়েছে। তিনি উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার, উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের মান সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে মাত্র তিন মাসের প্রশিক্ষণ দিয়ে ৪৫ বছর বয়স্ক ব্যক্তিদের ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে মাঠে পাঠানো হয়েছে এবং এদের জন্য আইন শিথিল করে বিভাগীয় পরীক্ষা মাফ করে দেয়া হয়েছে।

সবশেষে তিনি মন্তব্য করেন যে এক নির্বাচিত চেয়ারম্যানকে ঘিরে উপজেলা ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না। তিনি মনে করেন সরকারী কর্মকর্তাদের মান বাড়াতে না পারলে সরকারের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

উপজেলায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের মান উন্নয়নের প্রয়োজন আছে---একথা আমরাও স্বীকার করি কিন্তু রাতারাতি তা সম্ভব নয়। ডঃ আলী একজন ঊর্দ্ধতন সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে সরকারের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সরকারের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও তিনি ওয়াকেবহাল। তিনি ভাল করে জানেন যে কর্মকর্তাদের দ্রুত মান উন্নয়ন এর জন্য সরকারের হাতে এমন কোন আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপ নেই। উপজেলার প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে যে পরিস্থিতিতে বহুসংখ্যক কমকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে তা সকলের জানা। ডঃ আলীও সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তাই বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়ে উপজেলা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরালেই ভাল হতো। এ প্রসংগে মরহুম ব্রিগেডিয়ার ইউসুফ হায়দারের "ডেভলপমেন্ট দা উপজেলা ওয়ে" বইটির কথা উল্লেখ করা যায়। মরহুম ইউসুফ হায়দার অতি সহজ ভাষায় বলেছেন যে উপজেলার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে স্থানীয় নেতৃত্ব, সরকারী কর্মকর্তা ও জনসাধারণের সমন্বয় ও সুসম্পর্কের উপর। তার মতে যেখানে এ তিনটির সমন্বয় আছে সেখানে উপজেলা পদ্ধতি টিকে থাকবে আর যেখানে এ তিনটির সমন্বয় থাকবে না সেখানে জটিলতা দেখা দেবে। তিনি অবশ্য উপজেলা চেয়ারম্যানদের প্রশিক্ষণ ও তাঁদের জন্য প্রশিক্ষণ একাডেমী স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

উপজেলা চেয়ারম্যান কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহারের কথা বলতে গিয়ে ডঃ আলী নাচোল ও পলাশবাড়ী উপজেলার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। কিন্তু দেশে এমনও উপজেলা আছে যেখানে সরকারের নির্দেশমত সুষ্ঠুভাবে কাজ চলছে। এ ধরণের উপজেলার দৃষ্টান্ত তুলে না ধরায় বিষয়টি একেবারে এক তরফা হয়ে গেছে। উপজেলা সৃষ্টির ফলে বিচার ব্যবস্থাকে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু মানুষ কি এ নতুন ব্যবস্থার সুফল ভোগ করতে পারছে ? উপজেলায় নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচারকার্য পরিচালনা করতে গিয়ে নিরাপত্তার অভাব অনুভব করেন কিনা, তাঁদের পক্ষে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপ মোকাবেলা করতে হয় কিনা এবং এ পরিস্থিতিতে বিচারকার্যে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব কিনা---এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর ও এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সুপারিশ বইটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হলে ভালো হতো।

যা হোক বহু পরিশ্রম করে বাংলাদেশের রাজনীতি, উন্নয়ন ও উপজেলার উপর এমন একটি সুন্দর বই লেখার জন্য আমরা ডঃ আলীকে অভিনন্দন জানাই। সুন্দর ও প্রাণঞ্জল ভাষায় বর্তমান সরকার আমলের রাজনীতি, উন্নয়ন ও উপজেলার উপর তিনি এক ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করেছেন যা পড়ে এ দেশের মানুষ উপকৃত হবে। বইটি বাংলায় লেখা হলে সাধারণ শিক্ষিত মানুষের পক্ষে দেশের রাজনীতি, উন্নয়ন ও উপজেলা সম্বন্ধে অনেক অজানা তথ্য জানা সম্ভব হতো। তাই বইটির বঙ্গানুবাদ করার জন্য লেখককে অনুরোধ জানাই। উপজেলা সম্পর্কে মূল্যবান সুপারিশ সমূহ সরকার গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা। ২৪৭ পৃষ্ঠার বইটির মূল্য ধরা হয়েছে ১৭৫·০০ টাকা। মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্পের এ সংকটময় মুহূর্তে বইটির মূল্য যুক্তিসংগত মনে হলেও তা সাধারণ পাঠকের ক্রয় সীমার কিছুটা বাইরে চলে গেছে। বইটির মুদ্রণ সুন্দর ও পরিমার্জিত। মলাট ঝকঝকে তকতকে। প্রচ্ছদ প্রতীক ঢংয়ের না হয়ে সহজ ও স্বাভাবিক হলে পাঠকের কাছে আরো বেশী আকর্ষণীয় হতো।

—খবির উদ্দিন আহমেদ।

লেখক পরিচিতি

ডঃ শেখ মাকসদ আলী বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের একজন সদস্য। উন্নয়ন অর্থনীতিতে তিনি যুক্তরাজ্য থেকে পি, এইচ, ডি ডিগ্রী লাভ করেন। বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের তিনি প্রতিষ্ঠাতা রেক্টর ছিলেন।

ডঃ আকবর আলী খান বর্তমানে ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের ইকনমিক মিনিষ্টার পদে কর্মরত আছেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ছিলেন। কানাডা থেকে অর্থনীতিতে তিনি পি, এইচ, ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

মোঃ সফিউর রহমান বর্তমানে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সরকারী পদ্ধতি অনুবিভাগের পরিচালক। তিনি সাবেক নিগার সিনিয়র ইনস্ট্রাকটর ছিলেন।

নাসিরউদ্দীন আহমেদ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন)-এর সদস্য। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উপ-পরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে উন্নয়ন অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেছেন।

খবির উদ্দীন আহমেদ বর্তমানে ঢাকাস্থ আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উপ-পরিচালক। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন)-এ যোগদানের পূর্বে তিনি রাজশাহী কলেজে ইংরেজী বিভাগের প্রভাষক পদে কর্মরত ছিলেন।

আব্দুল মতিন বর্তমানে কেন্দ্রের গ্রন্থাগারিক হিসেবে কর্মরত। সুদীর্ঘ এক যুগেরও বেশী সময় ধরে তিনি গ্রন্থাগার পেশায় নিয়োজিত।

লেখকের জ্ঞাতব্য

প্রশাসন সমীক্ষায় প্রশাসন এবং উন্নয়ন প্রশাসন সম্বন্ধে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিবন্ধ ও গবেষণা টীকা মুদ্রিত হয়। এতদুদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট লেখককে পাণ্ডুলিপির ৪টি অনুলিপি সম্পাদকের নিকট জমা দিতে হবে। নিবন্ধ ও গবেষণা টীকা মুদ্রাক্ষরিত কাগজে যথাক্রমে ৪০ ও ২০ পৃষ্ঠার বেশী হওয়া বান্ছনীয় নয়। প্রাসঙ্গিক সূত্রসমূহ প্রবন্ধের শেষ পাদ টীকা ও প্রয়োজনে গ্রন্থপঞ্জী হিসাবে বর্ণিত হতে হবে।